একাত্তর
বাঙালি জাতির জন্ম

দেওয়ান আবদুল বাসেত সম্পাদিত

প্রকাশনার ২০ বছর

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
ঢাকা, বাংলাদেশ।
ISBN 984-8211-17-9

দেওয়ান আবদুল বাসেত সম্পাদিত
একাত্তর-বাঙালি জাতির জন্ম

প্রকাশকালঃ
ডিসেম্বর ২০০৪ইং
পৌষ ১৪১১বাঙলা

ইন্টারনেট সংস্করণ
ডিসেম্বর’০৪
২য় পরিমার্জিত ও সংশোধিত ইন্টারনেট সংস্করণ
জুলাই’০৫
আষাঢ়-১৪১২বাঙলা।

সংশোধিত তৃতীয় ইন্টারনেট সংস্করণ
ডিসেম্বর ২০০৫ /অগ্রহায়ণ ১৪১২বাঙলা
৪র্থ সংস্করণ জুন ২০০৬ইং
আষাঢ ১৪১৩আঙলা
৫ম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৬ইং
গ্রন্থস্বত্বঃ
সম্পাদক

প্রচ্ছদ ঃ
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
মেমোরিয়াল ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত
জাতির জনক এ্যালবাম থেকে নেয়া
*প্রখ্যাত অঙ্কনশিল্পী হাশেম খান এর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

কম্পিউটার কম্পোজঃ
লুবনা বাসেত বৃষ্টি
জেকরা বাসেত নদী

শুভেচ্ছা বিনিময়ঃ
বাংলাদেশে - একশত পঞ্চাশ টাকা
বাংলাদেশের বাহিরে-পাঁচ মার্কিন ডলার

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা...

সৌদি আরব এর রিয়াদ থেকে *মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স* কর্তৃক *"একাত্তর-বাঙালি জাতির জন্য "* নামের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে শুনে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি।

একুশের মাঝে যে কী বিশাল ন্যায়পরায়ণতা, সততা, আত্ম ও পারস্পরিক সম্মানবোধ রয়েছে তার কিছুটা অনুভব করা যায় '৭১ এর দিকে তাকালে। '৫২-'৭১ এ -১৯ বছরের মধ্যেই বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করাতে তাঁর অবদান সীমাহীন। '৫২-'৯৯ এ ৪৭ বছরের মধ্যেই পৃথিবীবাসী এ পৃথিবীর ভাষাসমুহকে রক্ষা, বিকাশ এবং আত্ম ও পারস্পরিক সম্মানবোধের প্রতীক হিসাবে তাঁকে বেছে নিয়েছে। একুশ, '৭১ বাঙ্গালী জাতির দিশারী, ন্যায়পরায়ণতার প্রেরণা জাতির গর্ব। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত 'এ সত্যকে' এবং তাঁদের অন্তর্নিহিত সত্যকে চর্চা করব। জাতি হিসাবে আমরা নিজেরা আলোকিত হব, শুধু তাই নয় এ আলো পৃথিবীবাসী অনেককে আলোকিত করবে।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে উজ্জ্বল ইতিহাস গড়ে গেছেন তার মাঝেই ইতিহাস গড়ার সকল ক্ষেত্র শেষ হয়ে যায়নি। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ রয়েছে। সুতরাং এ সকল উজ্জ্বল ইতিহাস সমূহকে প্রশ্ন করা বা বিকৃত করার প্রচেষ্টা নয় বরং ভাল কাজ করে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর নতুন নতুন ইতিহাস তৈরী করার জন্য দেশের প্রতিটি মানুষ এবং প্রতিটি নেতা নেত্রীর প্রতি অনুরোধ রাখছি।

মরুপলাশ সম্পাদক, ছড়াকার দেওয়ান অবদুল বাসেত, ড. আবদুল মোমেন সহ এ সুন্দর ও অর্থবহ এ প্রকাশনার সাথে যাঁরা জড়িত তাদের সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা জানাচ্ছি।

(রফিকুল ইসলাম)
প্রেসিডেন্ট,
মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্যা ওয়ার্ল্ড
ভ্যাঙ্কুভার
কানাডা
আগস্ট ২৬, '০৪

সম্পাদকের ছোট মুখে বড় কথা

এ**কাত্তর-বাঙালি জাতির জন্ম** গ্রন্থেই প্রথমবারের মতো ছোট মুখে বড় কথা বলার সাহস করেছি। আমি মুলতঃ নাদুস-নুদুস কাচ্চা-বাচ্চাদের নিয়ে ছড়া লিখেই মজা পেয়ে আসছি টানা তিরিশটি বছর ধরে। কখনও বড়দের নিয়ে কিছু লেখার ধৃষ্টতা দেখাইনি। নাবালক থেকে সাবালক হবার আকাঙ্খায় এবারই প্রথম তা দেখালাম। চারদিকের এত অনিয়ম কাহাতক সহ্য হয় (!?) যাঁরা সত্য-সুন্দরের পূজারী, মা-মাটি ও মানুষের প্রতি যাঁদের গভীর মমত্ববোধ। 'রাজনৈতিক মতামতে যাঁরা উদার মধ্যপন্থী।' ঠিক তেমনি ক'জন কলমযোদ্ধার লেখা কিছু স্মৃতিচারণ-প্রবন্ধ-নিবন্ধ নিয়েই ***একাত্তর-বাঙালি জাতির জন্ম*** ।

বঙ্গবন্ধু-বাংলাদেশ, বাঙালি ও বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু -মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা এসব শব্দগুলো একই সূত্রে গাঁথা। একে অপরের সম্পূরক। এদের আলাদা করার চেষ্টা করা মানেই শরীর থেকে একটি হাত কেটে ফেলা! এই নেতার জন্ম না হলে মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা-বাংলাদেশ কল্পলোকের গল্পই থেকে যেতো। বাঙালি জাতি হিসেবে একটি জাতির জন্মই হতো কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। সুতরাং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সত্যিকার অর্থেই একটি জাতির জন্মদাতার গৌরব অর্জন করেছেন। তাই আমি অকপটে উচ্চারণ করছি তিনি জাতির জনক। বিশ্বের অন্যান্য আপসহীন সংগ্রামী নেতাদের মতো আমি বঙ্গবন্ধুকেও আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। আর সে ভালোবাসা থেকেই এই গ্রন্থের জন্ম। গ্রন্থের প্রচ্ছদ এবং ভেতরে বঙ্গবন্ধুর কিছু দুর্লভ ছবি ব্যবহার করেছি গ্রন্থটির সৌকর্য বাড়াতে। এ জন্যে আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত ***জাতির জনক*** এ্যালবামের নিকট ঋণী।

দেশে তথ্য-সন্ত্রাস ও সর্বনাশী বন্যার মতো কাল্পনিক ইতিহাসের বন্যাও বয়ে চলছে সমান তালে। যাতে একাত্তর পরবর্তী প্রজন্মকে ইতিহাসের সঠিক চিত্র হতে দূরে রেখে শেখানো হচ্ছে খন্ডিত ও বিকৃত ইতিহাস। তাই নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে *মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স* এমনি একটি গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিশ্বাস করি এতে গ্রন্থের লেখকগন সৎ-মুক্ত ও শুভ চিন্তার পাঠকদের প্রশংসা কুড়াবে। গ্রন্থখানি প্রকাশের নেপথ্যে কিছু টক-ঝাল-মিষ্টি কাহিনী- ইহা প্রকাশের প্রস্তুতি যখন সম্পন্নপ্রায়- তখনই আসে এক প্রবল ঝড়!? সে ঝড়টি আসে আমার চারপাশে যারাই মুখে বলেন- 'আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বুকে ধারণ করি এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি।' সে তারাই গ্রন্থখানি প্রকাশে প্রধান অন্তরায়, পাহাড় হয়ে দাঁড়ান (!?) তবে সুখের কথা সকল বাঁধার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে অবশেষে গ্রন্থখানি আলোর মুখ দেখলো।

যে দু'জন মহান ব্যক্তির প্রেরণায় আমার একলা চলা নীতিতেও এ গ্রন্থখানি প্রকাশে সাহসী হয়েছি, তাঁদের একজন হচ্ছেন- ভ্যাঙ্কুভার, কানাডা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ***মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অব দ্যা ওয়ার্ল্ড*** এর ***প্রেসিডেন্ট*** জনাব রফিকুল ইসলাম। যাঁর প্রচেষ্টাতে অমর ২১ফেব্রুয়ারীকে আজ আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পেয়েছি। দ্বিতীয়জন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, কবি-প্রাবন্ধিক-কলামিস্ট এবং ***মরুপলাশ*** এর উপদেস্টা প্রফেসর ড. এ-কে আব্দুল মোমেন। এ গ্রন্থে তাঁদের কলমের আঁকা কিছু শব্দমালা দিয়েও এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। তাঁদেরকে বর্ণিল পাপড়ি-ছোঁয়া ধন্যবাদের সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করছি। এ ছোট মুখে বড়ো কথা বলার অন্তিম- লগ্নে বিশাল মনের অধিকারী এ দু'জনকে নিয়ে দু'টি পঙক্তি চলে এলো......

বৃষ্টি ভেজা কদম ফুলের সুবাস বুকে পোষেন,
হৃদয় তাঁদের মুক্ত যেন 'আটলান্টিক ওসেন'।

দেওয়ান আবদুল বাসেত
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
মরুপলাশ, রূপসী চাঁদপুর, মোহনা
রিয়াদ, সউদীআরব।

দেশের খ্যাতিমান শিল্পী হাশেম খানের আঁকা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(জাতির জনক এ্যালবাম এর সৌজন্যে)

একাত্তর–বাঙালি জাতির জন্ম

যে সকল সময়ের সাহসী কলমযোদ্ধাগন এ গ্রন্থখানিকে তাঁদের লেখায় অলংকৃত করেছেন

ড. এ-কে আব্দুল মোমেন (বোষ্টন, যুক্তরাষ্ট্র)	এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
হাবিবুর রহমান (জেদ্দা)	স্মৃতির সাতনরী হার একাত্তর
রফিকুল ইসলাম (ভ্যাঙ্কুভার, কানাডা)	স্বাধীনতা-Freedom
কুদ্দুস খান (যুক্তরাষ্ট্র)	বাংলাদেশ এখনো কাঁদে
তাহের ম. শায়েখ (জেদ্দা)	স্বাধীনতাঃ চালচিত্র বাংলাদেশ
আ. স. ম জিয়াউদ্দিন (কানাডা)	৭১ এর খোয়াই
মোঃ ফরহাদ হোসেন (সদ্য প্রয়াত)	স্বাধীনতার বেদিমুলে
সদেরা সুজন (মন্ট্রিয়ল,কানাডা)	মোর...... খ্যাত হোক/ আমি তোমাদেরই লোক মুজিব....স্বাধীনতা/ মুজিব মানেই বাংলাদেশ
নুরুলাহ্ মাসুম (দুবাই)	একাত্তরের স্মৃতি
ড.মনজুরুল ইসলাম	স্বাধীন দেশের নাগরিক ঃ দেশে ও প্রবাসে
দেওয়ান আবদুল বাসেত	একাত্তর বাঙালি জাতির জন্ম

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
ঢাকা, বাংলাদেশ।

‘এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম’ সে বজ্রকণ্ঠ এখনো ম্লান হয়ে যায়নি!

ড. এ-কে আব্দুল মোমেন

ছোটবেলায় মায়ের কাছে শুনেছি যে আমাদের এই সুন্দর বিশ্ব জগত ধ্বংস হবার আগে খানে দজ্জালের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন হারুত ও মারুত বিশ্বাসীদের ধ্বংস করে ফেলবে। বিশ্ব জগতের কোথাও তখন কোরআনের একটি আয়াত ও পাওয়া যাবে না-তারা সব ধ্বংস করে ফেলবে। ধর্মগ্রন্থের বাণী সাধারণত এলিগরিকেল হয়। আসল কথা আকার ইঙ্গিতে বুঝানো হয়। এর জন্যেই বুঝি ক্ষেত্র বিশেষে তফসীরের প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশের খালেদা - নিজামীর সরকার কি কোরআনের ‘খানে দজ্জাল’ রাজত্বের এক সাক্ষাত উদাহরণ। খানে দজ্জালের রাজত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে, যে আলাহ পাকে বিশ্বাস করবে, যে সত্য-সুন্দরে বিশ্বাস করবে, যে সঠিক কথা বলবে, সত্য কথা বলবে তাকে সাথে সাথেই খানে দজ্জালের সৈন্য সামন্তরা কতল বা হত্যা করবে। কোরানের বাণী সত্য সুতরাং তারা তা ছিঁড়ে ফেলবে এর স্থলে মিথ্যা পুস্তক, মিথ্যা তথ্য প্রচার করবে। তারা ক্ষমতাশালী হবে এবং এক হাতে চন্দ্র অন্য হাতে সূর্য- এধরণের বাহানা জনগনকে, বিশ্ববাসীদেরকে বিভ্রান্ত করবে।

বর্তমান খালেদা- নিজামী সরকারের অবস্থান দেখলে তাই মনে হয়। তারা যারা সত্যে বিশ্বাস করে তাদেরকে কতল করার ষড়যন্ত্রে রয়েছে এবং সত্য পুস্তক, সত্য তথ্য ধ্বংস করে তার স্থানে মিথ্যা তথ্য ও মিথ্যা পুস্তক উপহার দিয়েছে। এর প্রধান উদাহরণ হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতি। ‘স্বাধীনতার সত্য তথ্য ধ্বংস করে তার স্থানে মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যের সংযোজনে খালেদা -নিজামী সরকার আদাজল খেয়ে লেগেছে। স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ নায়ক, বাংলার হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ পুরুষ যাঁর প্রজ্ঞা, নেতৃত্ব, সাহস, বলিষ্ঠতা ও ত্যাগের বিনিময়ে ‘স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা’ সম্ভব হয়েছে। তাঁকে খাটো করার এবং তাঁর অবদানে কালিমা লেপনে বর্তমান খালেদা- নিজামী সরকার বদ্ধ পরিকর। এ উদ্দেশ্যে তারা বানোয়াট তথ্য তৈরী করেছে। তারা বলছে খালেদা জিয়ার প্রয়াত স্বামী মুক্তিযোদ্ধা মেজর জিয়াউর রহমান নাকি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক। তিনিই নাকি ‘স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন সর্ব প্রথম ২৫শে মার্চের দিন গত রাতে। মিথ্যার ব্যাসাতি আর কাকে বলে?

জিয়া সাহেব ২৫শে মার্চের রাতে ঘোষণা দিয়েছেন বলে তাদের দাবী, তাহলে আমি কি অপরাধ করলাম? আমি তো ১লা মার্চে যখন দুপুর বেলার সংবাদে শুনতে পেলাম যে পাকিস্তানের সামরিক প্রধান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দিয়েছেন যে, সংসদ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হলো- আমরা তো তখন সাথে সাথেই রাস্তায় নেমে পড়ি এবং জোর গলায় আওয়াজ তুলি স্বাধীন বাংলাদেশের। জিয়া সাহেবের আগেই আমাদের মতো আরো অনেকেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ঐদিন পূর্বাণী হোটেলে আমরা যারা উপস্থিত হই সবাইতো স্বাধীনতার ডাক দেন। জিয়া সাহেব তো ২৫তারিখ পর্যন্ত পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে চাকরি করেন, আমি তো তার আগেই চাকরি ছেড়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি। ২২ মার্চ

১৯৭১ সাল থেকে ১৯ জানুয়ারী ১৯৭২ সাল পর্যন্ত চাকরি থেকে পালিয়ে বেড়াই। ১৯ মার্চ ১৯৭২ থেকে ভারতের গৌহাটি থেকে চাকরিতে যোগদানের টেলিগ্রাম পাঠাই।

কথা হচ্ছে আমার মতো অনেক অনেক তরুণ যুবক, অনেক অনেক প্রবীণ নেতৃত্ব ১লা মার্চের পর থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তবে যেহেতু স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার আইন সম্মত কোন অধিকার আমাদের ছিল না, আমি নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছিলাম না বা বাংলাদেশের অবিসংবাদিত, নির্বাচিত নেতা ছিলাম না, সে জন্য আমাদের ঘোষণা আইন সম্মত নয়-নিরর্থক।

বস্তুত: স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার একমাত্র আইন সম্মত অধিকার ছিল একজনেরই। এবং তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশের নির্বাচিত নেতা, সাড়ে সাত কোটি বাঙালি জনতার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর দল তৎকালীন ৩০০টি সংসদ আসনের মধ্যে ২৯৭টিতে জয়লাভ করেন। আমার মনে পড়ে ৩রা মার্চ তৎকালীন বাংলাদেশের সত্যিকারের রাষ্ট্রনায়ক যাঁর আদেশে চাকা চলে, গাড়ি-ঘোড়া চলে, ব্যাংক চলে, অফিস-আদালত চলে, যাঁর আদেশে লোকজন অফিসে যায়। সেই মহাপুরুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডিস্থ ৩২ নং রোডে যখন উপস্থিত হই, তখন অনেকেরই হাতে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা (স্বাধীনতার পর তা পরিবর্তিত হয়) লাল সবুজ পতাকা। এবং অনেকেই তখন স্বাধীন বাংলাদেশের শোগান দিচেছ তার সাথে আমরাও শামিল হই।

মেজর জিয়া ৩ তারিখ নয়, ২৬ তারিখে স্বাধীনতা সংগ্রামে শরীক হন। আমাদের অনেক পরে। ৭ই মার্চের সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে একটি সমাবেশ হয়। এবং তাতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। দুপুর থেকেই আমরা যখন বঙ্গাবন্ধুর ঐতিহাসিক রেসকোর্সের ভাষণ শোনার জন্যে জমায়েত হই, তখন সভাস্থলের উপর দিয়ে বার বার সামরিক হেলিকপ্টার ও বিমান মহড়া দিতে থাকে। আমরা তখন স্থির নিশ্চিত যে বঙ্গাবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেবেন। আমাদের আশা কিন্তু তিনি পুরণ করেন। তাঁর অপূর্ব, বলিষ্ঠ ভাষণের প্রতিটি শব্দ আমাদের হৃদয় পুলকিত করে, রক্ত গরম করে, স্বাধীনতার দৃঢ় প্রত্যয়ে আমরা উজ্জীবিত হই। তিনি অর্বাচিনের মতো বলেন নি 'আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম'। তার পরিবর্তে তিনি বলেন- 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। শুধু তাই বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি তিনি আরো বলেন- 'আপনারা জানেন ও বুঝেন....মনে রাখবা আমি যদি তোমাদের হুকুম দেবার না পারি তোমদের যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবে, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো'।

বঙ্গাবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার ঘোষণা আইনের মারপ্যাচে হুবহু না দিলেও 'আকলবন্ধ' স্বাধীনচেতা সংগ্রামী বাঙালিদের কিভাবে কি করতে হবে তার দিক নির্দেশনা দিয়ে যান। 'আমি যদি হুকুম দেবার না পারি.. ... ..' বক্তব্যের মধ্যে তিনি জাতিকে সজাগ করে দেন যে, তাঁকে যদি পাক বাহিনী হত্যা করে বা কারারুদ্ধ করে তখন আমাদের কি করতে হবে। 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো.. ... ... যার যা আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে .. .. .. এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম .. .. ..' । আনুষ্ঠানিক ভাবে একে 'স্বাধীনতার ঘোষণা' না বললেও তার ভাষণে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য কি কি করা প্রয়োজন তার সব ইঙ্গিত ও নির্দেশনা এতে রয়েছে। সুতরাং যারা আজ খানে দজ্জালের মত এই সত্য বাণীকে, এই সত্য উপলব্ধিকে ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছেন তাদের জাতি কি কখনও ক্ষমা করবে?

১৯৭১ সালের ৪ঠা এপ্রিলে আমি যখন আমাদের সিলেটের বাসার সামনে পাকসেনানীর কড়া হুকুম 'যার বাসার সামনে ব্যারিকেড তৈরী হবে, সেই বাড়িটি ধ্বংস করে দেয়া হবে'। তা উপেক্ষা করে ব্যারিকেড

তৈরী করি। তখন জিয়া সাহেব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন, না হান্নান সাহেব দিয়েছেন, না যদু মধু দিয়েছেন তা আমাদের মোটেই ধর্তব্য ছিল না। কেউ না দিলেও আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যেতাম।

কারণ ৭ই মার্চে বঙ্গাবন্ধু আমাদেরকে স্পষ্টত: নির্দেশনা দিয়ে গেছেন .. .. .. 'যার যা আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা কর'। সিলেট শহরে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় আমাদের বাড়ি থেকে ৪ঠা এপ্রিল। এ দিন বিকেলে বাড়ি থেকে পাক হানাদার বাহিনীর উপর গুলি চালালে তারা আমাদের বাড়িটি মর্টার দিয়ে ধ্বংস করে দেয়। তখন আমাদের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন ইপিআর বাহিনীর ডজন-খানেক বাঙালি বীর সন্তান। এর আগের দিনে তাদের যখন বলা হয় যে, তারা তাদের হাতিয়ার জমা দিতে তখন তারা ইপিআর এর ছাউনি থেকে পালিয়ে এসে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়.. .. তাদের কেউ তখন জানে না 'স্বাধীনতার ঘোষণা' কেউ দিয়েছে কি না.... তবে তারা জানে স্বাধীনতা ছাড়া বঙালির কোন ভবিষৎ নেই।

বঙ্গাবন্ধুর প্রগাঢ় রাজনৈতিক ধীশক্তি ও প্রজ্ঞা থাকায় তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে এক অপূর্ব সম্মিলনি সৃষ্টি করেছেন। এই ভাষণের প্রেক্ষিতে স্বাধীনতাকামী সকল বাঙালি বঙ্গাবন্ধুর উপর নির্যাতন হলে বা তাঁকে বন্ধী করলে সঙ্গো সঙ্গোই স্বাধীনতার যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। তবে সরকার যদি তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে চিহ্নিত করে ফাঁসি দেওয়ার পায়তারা করে তাহলে এ ভাষণ তাদের হতাশ করবে। যে সমস্ত বাংলাদেশী যারা পাকিস্তানের সপক্ষে ছিলেন তাদের কাছে এ ভাষণ স্বাধীনতার ইঙ্গিত নয়। তারা তাদের তালে এর তফসির করে।

১৯৭১ সাল ২২শে মার্চে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেতা তাজউদ্দিন আহমেদ, মোলা জালাল উদ্দিন, নারায়নগঞ্জের গোলাম সারোয়ার প্রমুখ ইমারর্জেন্সিতে আসেন আহত কর্মীদের দেখতে। মেডিক্যাল হাসপাতালের বারান্দায় তাদের সাথে দেখা-জিজ্ঞেস করলাম কিসের জন্যে এসেছেন? বলেন আহত কর্মীদের দেখতে এসেছেন। তাজউদ্দিন সাহেবের সাথে রাওয়ালপিন্ডির গোল টেবিলের বৈঠকে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ১৯৬৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা কমানোর জন্যে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন এবং বঙ্গাবন্ধু তাতে যোগদান করেন। ছাত্র জনতার প্রবল দাবীর প্রেক্ষিতে আইয়ুব খান বঙ্গাবন্ধুকে জেল থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। আমি তখন রাওয়ালপিন্ডিতে ইসলামাবাদ ইউনিভারসিটির ছাত্র। আমরা তখন মাত্র ৬জন বাংলাদেশী ছাত্র। এদের মধ্যে সহপাঠী ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, আনিসুল ইসলাম (এরশাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী) মাহমুদুল আলম (বি আই ডি এস), এহতেশাম চৌধুরী (শিল্পপতি)। তাছাড়া ছিলেন অংক বিভাগে চাটগাঁর মাসুম, পদার্থ বিদ্যা বিভাগে সিলেটের বদরুজ্জামানসহ সবাই মিলে বঙ্গাবন্ধুকে স্বাগত সংবর্ধনা দেয়ার আয়োজন করি। আমি একটি ব্যানার তৈরী করি এবং তাতে লিখি 'বঙ্গাশার্দুল' শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গাবন্ধুর শত্রু সংখ্যা তখন পাকিস্তানে অনেক । তাই তার নিরাপত্তার জন্যে তাঁকে কার্গো দিয়ে বের করে নেয়া হয়। এবং পেনের সদর দরজা দিয়ে মিজানুর রহমান চৌধুরী বের হন। হাজার হাজার অভ্যাগতরা তাকেই বঙ্গাবন্ধু মনে করে স্বাগত জানায়। এখানে বলা অসঙ্গাত হবে না (পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাস করার আগে আমি শেখ মুজিব বা তার দল সম্পর্কে 'পুওর অপিনিয়ন' পোষণ করতাম) রাতে বঙ্গাবন্ধুর সাথে রাওয়ালপিন্ডির ইষ্ট পাকিস্তান হাউজে পরিচয় হয়। তখন রাওয়ালপিন্ডিতে ঘটা করে একুশে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠান করছিলাম। এবং এখানে স্থানীয় টিভিতে একুশের অনুষ্ঠানের একটি এ্যাড্ দিতে বাঁধাগ্রস্থ হলে অনেকের কাছে গিয়ে ব্যর্থ হই। খাজা শাহাবুদ্দিন তখন তথ্যমন্ত্রী। বঙ্গাবন্ধুকে তখন ঘটনাটি বললে তিনি তাৎক্ষণিক খাজা শাহাবুদ্দিনকে ফোন লাগাতে বলেন। পরেরদিন সকালে সৈয়দ নজরুল ইসলাম খাজা সাহেবের সাথে আলাপ করলে আমাদের একুশের এ্যাডটি দেয়ার অনুমতি মিলে। রাওয়ালপিন্ডির

গোলটেবিল বৈঠক চলাকালে বঙ্গাবন্ধু ও তাঁর দলের সার্বক্ষণিক সহকারী হিসেবে উপস্থিত থাকায় তাজউদ্দিন সাহেবের সাথে পরিচয় ঘটে ঘনিষ্ঠভাবে।

বঙ্গাবন্ধুর উদারতা ও বাঙালি প্রেম আমাকে মুগ্ধ করে। তাজউদ্দিন সাহেব জানালেন যে, ইয়াহিয়া মুজিব আলোচনা খুব উত্তম নয়। তার কথার ইঙ্গিতে, বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, অবস্থা খারাপ হতে পারে। তিনি বিশেষ করে বাচ্চাদের ঢাকার বাহিরে নিয়ে যেতে উপদেশ দিলেন। সুতরাং পরের দিন বড়বোনের বাচ্চাদের নিয়ে সিলেটে পাড়ি দেই। এই আশায় যে ঢাকায় যদি আন্দোলন চলে, সিলেটে তা কম হবে। তাছাড়া আমার বস্ ছিলেন তখন এক উর্দুভাষী পাঞ্জাবী-১লা মার্চের পর থেকেই কাজে ঠিকমতো যাচ্ছি না, তার জন্যে তিনি অসন্তোষ ও সন্দেহের চোখে দেখছেন। মুলত: ১লা মার্চের পর থেকেই অফিস আদালত বাদ দিয়ে আমি তখন সার্বক্ষণিকভাবে সভা-সোভাযাত্রা নিয়েই মহাব্যস্ত।

২৫ মার্চের বিভীষিকাময় ঢাকার হত্যাযজ্ঞ আমি দেখিনি। তবে পরের দিন সিলেট ছিলো থমথমে। ঢাকার খবরা খবর নেয়ার জন্যে আমরা হন্তদন্ত হয়ে অস্থিরতা করছি। ২৭ মার্চ খবর পেলাম যে বঙ্গাবন্ধু পাকসেনাদের হাতে বন্ধী হবার আগে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং ২৮শে মার্চ সর্বপ্রথম রেডিওতে মেজর জিয়াউর রহমানের কন্ঠে শোনতে পেলাম...... 'আমি জিয়া বলছি-আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে...........'

আমরা তাতে আনন্দিত হলাম যে, বাঙালি জোয়ানরাও আমদের সাথে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছেন। আমি কিন্তু জিয়ার কন্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা শোনেছি ২৮শে মার্চে। পরবর্তীতে আমার বন্ধু তৎকালীন সময়ে চাটগাঁ রেডিও ষ্টেশনে কর্মরত আব্দুলাহ আল ফারুক এবং স্বয়ং মেজর জিয়া সাহেবের মুখে শুনেছি যে, তিনি ২৭ তারিখ সর্বপ্রথম চাটগাঁ বেতারে ঘোষণাটি দেন। ডেপুটি চীফ অব ষ্টাফ এবং ডি-সি-এম-এল-এ থাকাবস্থায় প্রয়াত মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সাহেবের সাথে সাক্ষাত ও কথা বলার সুযোগ হয়েছে আমার অনেক। তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন। তবে তিনি কখনো নিজে স্বাধীনতার ঘোষক দাবী করেননি। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান যখন ডেপুটি চীফ অফ ষ্টাফ ছিলেন তখন তিনি আমার তৎকালীন বস বানিজ্য প্রতিমন্ত্রী দেওয়ান ফরিদ গাজী সাহেবের কাছে অনেক বারই এসেছেন। তাঁর বিশেষ অনুরোধে আর্মীদের জন্যে অতিরিক্ত টি-ভি সেট, রিফ্রিজারেটর, ব্যাটারী ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা আমরা করেছি। তাছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে যেহেতু দেওয়ান ফরিদ গাজী সাহেব সিলেট এলাকায় আঞ্চলিক বেসামরিক প্রধান ছিলেন তারফলে জেড্ ফোর্সের অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।

জিয়াউর রহমান জীবিত থাকলে খালেদা-নিজামী সরকারের মিথ্যাচারে তিনি ও মর্মাহত হতেন। তাদের মিথ্যাচার মরহুম জিয়াউর রহমানের আত্মা নিশ্চয়ই শান্তি দিচ্ছে! মেজর জিয়াউর রহমানের একটি লেখা যা অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রায় ১৯৭৪ সালের ২৬ শে মার্চে প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি নিজেই কিভাবে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিলেন তা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেন। তার একান্ত সহচর কর্ণেল (অব:) অলিও কিভাবে তারা মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করলেন তাও বিস্তারিত লিখেছেন। তাদের কারো বক্তব্যে মেজর জিয়া ২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন বলে কোনো স্বীকারোক্তি নেই। বরং কর্ণেল অলি লিখেছেন "মেজর জিয়া জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ২৭ শে মার্চ বিকেল বেলা দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন"।

বি,এন,পি নেতা মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীও অনরূপ বক্তব্য রাখেন। মেজর জিয়া একজন সুযোগ্য মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর জেড্ ফোর্স সাহসের সাথে যুদ্ধ করে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে

সহায়ক হয়েছে। তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় বীর মুক্তিযোদ্ধা--কাদের সিদ্দিকী, মীর শওকত আলী, কর্ণেল অলি, কর্ণেল জাফর ইমাম, জেনারেল আব্দুর রব, সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম-এ-জি ওসমানী-তাঁরা প্রত্যেকেই বীর মুক্তিযোদ্ধা।

কিন্তু তাই বলে 'স্বাধীনতার জনক বা ঘোষক নয়'। স্বাধীনতার জনক একজনই এবং তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনতা একজনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপ দেয় এবং তিনি হচ্ছেন বাংলার গৌরব, বাংলার শ্রেষ্ঠ পুরুষ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বোষ্টন, ইউ,এস, এ
৮আগস্ট ২০০৪ইং

*লেখক পরিচিতিঃ **এ-কে আব্দুল মোমেন পি.এইচ.ডি***
লেখক একজন বাঙালি মার্কিন নাগরিক। অধ্যাপক, অর্থনীতিবিদ, কলামিষ্ট এবং একজন কবি। বোষ্টনে সপরিবারে বসবাস করেন। আন্তর্জাতিকভাবে নারী ও শিশু পাচার বন্ধের উদ্যোগে তাঁর বিভিন্ন সাফল্যজনক কার্জক্রম প্রাক্তন ইউ এস প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে।

***মরুপলাশ** গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ - **'বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রতিবন্ধক - আমলাতন্ত্র'** ১৯৯৯ সালে অমর একুশে বইমেলায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বর্তমানে গ্রন্থখানির ইন্টারনেট সংস্করণ মরুপলাশ ওয়েব ম্যাগাজিনে খুঁজে পাওয়া যাবে। মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী বাঙালি কবিদের কবিতা নিয়ে **মরুপলাশ** প্রকাশ করেছিলো একখানি যৌথকাব্য গ্রন্থ **'দেয়াল বিহীন কারাগার-এর প্রেম'** নামে। সে যৌথকাব্যে এ লেখকের কয়েকটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। তখন লেখক সউদী অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের সবচে' বর্ষীয়ান বাংলা প্রকাশনা-সউদী আরবের রিয়াদ থেকে প্রকাশিত **মরুপলাশ** সাহিত্য পত্রিকার তিনি সম্মানিত উপদেষ্টা*

স্মৃতির সাতনরী হার একাত্তর

হাবিবুর রহমান

সম্পাদক তো বলেই খালাস। লিখতে বসে দেখলাম। যত সহজে একাত্তরের কথা লিখবো ভেবেছিলাম তত সহজে লেখা সম্ভব নয়। একাত্তর তো শুধু বর্ষপঞ্জির একটি বছর মাত্র নয়। একাত্তর সহস্র বছরের পুঞ্জিভূত বেদনা, হতাশা, অতৃপ্তি, শোষণ, বঞ্চনা ও অপ্রাপ্তির মহাকাব্য। একাত্তরের মহান বিশাল মহাকাব্য লিখতে আরো কত শত একাত্তরের আত্মাহুতি ও রক্তে লিখা হয়েছে বাঙ্গালী জাতির শ্রেষ্ঠতম, মহত্তম অর্জনের রক্তলাল ইতিহাস। আজ সে একাত্তরকে বিকৃত করার জন্য উঠে পরে লেগেছে খান্নাছের দল। বিশাল বিশাল আজদাহা আজ খাঁড়া হয়েছে আকাশ সমান উচ্চতার সেই শালপ্রাংশু মহামানবের মুন্ডু ছেদনের অজুহাত খুঁজতে। ''ঐ মহামানব আসে''। মহামানবের আবির্ভাব হয় কোন দেশ জাতির ক্রান্তিলগ্নে। মহামতি এ্যারিস্টটল বলেছেন '' পৃথিবীতে মহত্তম কাজের শ্রেষ্ঠতম মানুষ সেই যিনি সৃষ্টি করেন একটি রাষ্ট্র''। নিশ্চিতভাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পৃথিবীর সেই বিরল শ্রেষ্ঠতম মানুষদের একজন।

নদী বিধৌত বাংলা নামক এ গাঙ্গেয় বদ্বীপের নরোম পলিমাটিতে বেড়ে উঠা কঠিনে কোমলে, রাগে ও অভিমানে, প্রেমে ও রিরিংসায় ত্যাগে ও আবেগে যুদ্ধ উম্মাদনায় ও শান্তির কপোত হাতে এ বাঙ্গালী জাতির সহস্র বছরের ইতিহাস বিচ্ছিন্নতাবাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ, পারস্পরিক হানাহানি খন্ড বিখন্ড গোষ্ঠিবদ্ধ জোঁয়ার ভাটার ইতিহাস। শক হুন, আর্য অনার্য তাঁতার মঙ্গোল অস্ট্রিক পুর্তগীজ ইংরেজ পীত নীলাভ কালো ও ধলোর মিশ্র রক্তের এই শংকর জাতিকে একই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের মোহনায় একই মন্ত্রে দিক্ষিত করে ঐক্যবদ্ধ জাতিতে রূপান্তরিত করে একটি অসম মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম জাতিতে পরিণত করা শুধু একটি একাত্তর বা নয় মাসের সফল পরিণতি বলে যারা গর্বোন্মাদনায় শুন্যে আস্ফালন করেন তাদের জন্য এক সময় করুণা হতো।

এখন ভয় হয়। আজ পাঠ্য পুস্তকের শিশুতোষ বই হতে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতির নজীরবিহীন বিস্তৃতি ঘটানো হচ্ছে। দেশের কোমলমতি ছাত্রছাত্রী থেকে আপামর ভোলাভালা সাধারণ জনতা এ বিকৃতির শিকার হয়ে ইতিহাস ঐতিহ্য ও পুর্বপুরুষদের শোর্য বীর্য বীরত্ব সম্বন্ধে অন্ধকারে থেকে মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিনাশী কার্যকলাপে শামিল হচ্ছে নিজের অজান্তে । তাই ভয় হয় একাত্তরের কথা লিখতে যেয়ে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শতসহস্র বই লেখা হয়েছে।

ছোট বড় মাঝারী সব ধরণের মুক্তিযোদ্ধাই নিজেদের উজ্জ্বল ভুমিকা ও অপারেশনে নিজেদের বীরত্ব নিয়ে কিছুনা কিছু স্মৃতি কথা লিখেছেন এবং এখনো লিখছেন। আমি না হয় স্মৃতি কথার চিরাচরিত পথে না হেঁটে একটু বেপথুই হলাম। ক্ষুন্নিবৃত্তির জ্বালায় দেশ ছাড়া একটি অতি সাধারণ মানুষ যাকে দেশ ছাড়তে হয়েছিল ছিয়াত্তরে একাত্তরে নয়। তার কথার মুল্যেই বা কি? শুনার ধৈর্য্যই বা কার? আর লেখা কাগজ -? আকাশ সংস্কৃতির দাপটে পড়াতো দুরের কথা চেয়ে ও দেখে না কেউ। তবু ও লিখতে হবে সম্পাদকের নির্দেশ। আমার ও প্রাণের দায়।

ঢাকা ঘুরে এলাম ক'দিন আগে। সেদিন নিউ মার্কেটের কোণ থেকে হোম ইকনোমিক্স কলেজের শেষ মাথায় দাঁড়ানো রিক্সায় উঠে চললাম মালিটোলা যাবো সাথে কবি আবদুর রাজ্জাক একটি

দৈনিক পত্রিকা অফিসের দিকে। অনেক অনেক বছর পর পুরাণো ঢাকার পথে আমার যাত্রা। পলাশী ব্যারাকের মোড়ে দেখি দুটি টাট্টু দাঁড়িয়ে আছে কারুকার্যখচিত গাড়িটিকে টেনে নেয়ার জন্য।

পলাশী দিয়ে যেতে যেতে বাম পাশে বুয়েটের দালানগুলি দাঁড়িয়ে আছে। আজো কিছু গাছের ছায়া আছে। আছে কিছু জংগল। ওর ভেতর আছে একটি মাঠ। একাত্তরের মার্চের প্রথম দিকে যেখানে শুরু হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ট্রেনিং। আর ছাত্রীদের ট্রেনিং হয়েছিল সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের খেলার মাঠে। যেখানে ট্রেনিং নিয়েছিলেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। গ্রুপ লীডার ছিলেন মমতাজ বেগম। ডামি রাইফেল কাঁধে রাজপথ কাঁপিয়ে জয় বাংলা শোগান মুখরিত মিছিল যাচ্ছে ধানমন্ডির দিকে। সবার আগে মমতাজ আপা পিছনে শেখ হাসিনা।

কাগজে কাগজে সেদিন প্রথম পৃষ্টায় ছবিটি ছাপা হয়েছিল। মিছিলের সেই ঐতিহাসিক ছবিটি এক সময় টানানো ছিল মহিলা সমিতিতে আজ আছে কিনা জানিনা। আমাদের ট্রেনিং দিতেন চিশতি ভাই ও কামাল ভাই। শাহ হেলালুর রহমান চিশতি। মাঝে মাঝে ট্রেনিং দিতে আসতেন তৎকালীন ইষ্টবেঙ্গাল রেজিমেন্টের অফিসাররা। তারা আসতেন সিভিল ড্রেসে। কাউকে চিনতাম না। ঔৎসুক্য ছিল। কিন্তু গোপনীয়তার স্বার্থে কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতাম না। এখানে ছাত্র ছাড়াও অছাত্র সাধারণ তরুণেরা ট্রেনিং নিত। মার্চের শেষের দিকে সম্ভবতঃ ২৩শে মার্চের পুর্বেই ২৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা ফাইনালি সিলেকটেড হয়েছিল। তার মধ্যে আমিও একজন।

এঁদের সবাই পরবর্তীকালে দেরাদুনে মুজিববাহিনীর ট্রেনিং পেয়েছিলেন। একাত্তরের কথা লিখতে হলে তার পটভুমি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন। ১৯৬৮ সনে এসএসসি পাস করে আমি ভর্তি হয়েছিলাম বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইনিষ্টিটিউটে। সর্বোচ্চ ষ্টাইপেন্ড ও পেয়েছিলাম। উনসত্তরে আমি টেক্সটাইলের ছাত্র। আমার সাথে যারা পড়তো তাদের মধ্যে দুজনের সাথে আমার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। এ দুজনই আমাকে ছাত্র রাজনীতিতে টেনে এনেছিল। একজনের নাম ইসমাঈল হোসেন। ডাক নাম শেলী। অন্য জনের নাম হেদায়েত হোসেন। ডাক নাম নিজাম। শেলী সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের টেনের ছাত্র থাকাকালীন মোনায়েম খান বিরোধী আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়েছিল। ছোট বিধায় তাকে জেলে নেয়া হয়নি। গভর্ণর হাউজে বেশ কিছুদিন আটকে রাখা হয়েছিল। নিজাম ছিল শহীদ আসাদের শিষ্য।

আজিমপুরের শেখ শাহ বাজার লেনে আসাদ তারঁ বড় বোনের বাসা থেকে পড়াশুনা করতেন। পাশের বাড়িতে নিজাম ও তার বড় বোনের বাসা থেকে পড়াশুনা করতো। আসাদের সাথে নিজাম প্রায় প্রতিদিনই মিছিলে যেতো। ঐ সময় আমাদের পড়াশুনা চাংগে উঠেছিল। আসাদ যেদিন গুলিবিদ্ধ হন সেদিন নিজাম তাঁর সাথে ছিল না। হয়তো সে কারণেই সে বেঁচে যায়। টেক্সটাইল ও পলিটেকনিকের আমরাই প্রথম ফার্মগেটের আইয়ুব খানের ''ডিকেট অব প্রোগ্রেসের '' বিশাল গেট ভেংগেচুরে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের মিছিল সাধারণতঃ ফার্মগেট হয়ে নিউ মার্কেটের দিকে যেতো। নিউ মার্কেট থেকে ইডেন গার্লস কলেজ হয়ে পলাশী দিয়ে ভার্সিটি এলাকায় ঢুকতো।

একদিন মিছিলে গুলি হলো। প্রথমে টিয়ার গ্যাস পরে গুলি। মিছিল তখন ইডেন ক্রস করছিল। আজিমপুর কলোনীর দেয়াল ঘেঁষে আমরা শুয়ে পড়লাম। তাপস আমার হাত ধরে টেনে শুইয়ে দিয়েছিল। তাপস পলিটেকনিকে পড়তো। আমাদের উপর দিয়ে এক পশলা ইলশেগুড়ি বৃষ্টির মত গুলির ঝাঁক চলে গেল। কয়েকজনের হাতে পায়ে গুলি লেগে সামান্য আহত হয়েছিলেন। ইডেনের ছাত্রীরা দোতলা থেকে জগভর্তি পানি ছিটিয়ে আমাদের ধুয়ে দিয়েছিলেন। সে পানিতে চোখ ধুইয়ে রুমাল ভিজিয়ে আমরা টিয়ার গ্যাসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। আমার আজো মনে আছে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা যখন ঢাকায়

প্রবেশ করলাম তখন ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে ঢাকাবাসী মা বোনেরা আমাদের বরণ করে নিয়েছিলেন। সেদিন আমাদের মিছিলে সামান্য গুলি হয়েছিল। প্রথমে বুঝতে পারিনি পরে জানলাম। ঐ দিনের মিছিলেই নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণীর ছাত্র মতিয়ুর রহমান গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়েছেন।

উনসত্তরের ১১ দফা আন্দোলনের সেইদিনগুলি এতোটাই বেপরোয়া এতোটাই উত্তাল আর এতোটাই স্বনিয়ন্ত্রিত সুশৃংখল ছিল যে, আমাদের মত তরুণ ছাত্রদের পক্ষে তার থই পাওয়া কঠিন ছিল। তবে হ্যা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তটা ছাত্রনেতারা নিতেন আর তা আলোর গতিতে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়তো। আমরা সেভাবেই মিছিল মিটিংয়ে যোগ দিতাম। উনসত্তরের ১১ দফা আন্দোলনে রমনার মগবাজার এলাকার ছাত্র সমাজের বিরাট ভূমিকা ছিল।

ধীরে ধীরে আমি ছাত্রলীগের রাজনীতিতে এমনভাবে জড়িয়ে গেলাম যে আর বের হওয়ার উপায় রইলো না। তখনও দোহার থানায় ছাত্র রাজনীতি দানা বেধেঁ উঠে নাই। সাইফুদ্দিন ভাই তখন বড় ছাত্রনেতা। জগন্নাথের জিএস। রেজা ভাই ভিপি। কিন্তু দোহার থানার ছাত্র রাজনীতিকে সংগঠিত করার ব্যাপারে সাইফুদ্দিন ভাইর আগ্রহ কম। অথচ তাঁরই ভাবশিষ্য রব-মান্নান দোহার থানায় ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্র ইউনিয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ছাত্রলীগ কোন সংগঠিত শক্তি ছিল না।

এমন কি ৬৯ এর ছাত্র আন্দোলনে নবাবগঞ্জ থেকে সেলিম চৌধুরী কিছু ছাত্র এনে জয়পাড়ায় মিটিং করে যান। দোহার থানায় তখন কোন ছাত্রনেতা পাওয়ার যায়নি সে মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করার জন্য। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অরাজনৈতিক ছাত্র মুজিবুর রহমানকে অনেকটা অনুরোধে ঢেঁকি গেলার মতই সভাপতিত্ব করতে হয়। অবশ্য ১১ দফা আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন সাইফুদ্দিন ভাইর নেতৃত্বে জয়পাড়ায় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। আমরা আইয়ুব খানের সমর্থক প্রবীন মুসলিম লীগ নেতা ওয়াসেক সাহেবকে জয়পাড়ায় ঘেরাও করে রেখে ছিলাম দীর্ঘ সময়।

উনসত্তরের ১১ দফা ছাত্র আন্দোলনের মুল উৎস ছিল আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলন। ৬ দফাকে ভিত্তি করেই ১১ দফা রচিত হয়েছিল। ১১ দফা আন্দোলনের প্রথম দিকে এর নেতৃত্ব ছিল বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির হাতে। কিন্তু আন্দোলন দ্রুত বেগবান হতে থাকলে নেতৃত্ব চলে যায় ছাত্রলীগের হাতে। সম্ভবতঃ বাম ছাত্র সংগঠন গুলির মধ্যে রুশ- চীন আদর্শিক দ্বন্দ্বই তাদের নেতৃত্বকে দুর্বল ও সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। অপরদিকে ছাত্রলীগের আন্দোলন চলতো আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলায় আটক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবের পরিকল্পনা ও নির্দেশে । তাই চূড়ান্ত পর্যায়ে ১১ দফা আন্দোলনের সাফল্য আসে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে। আমাদের কাছে তখন হিরো ছিলেন তোফায়েল আহমদ। তোফায়েল আহমদকে এক নজর দেখার জন্য আমরা পাগল থাকতাম।

নুরে আলম সিদ্দিকী, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, আসম আব্দুর রব, শাজাহান সিরাজরা আমাদের কাছে ততোটা গুরুত্ব পেতো না। আমরা ঝুঁকে পড়েছিলাম দাদার দিকে। দাদা ছিলেন বঙ্গাবন্ধুর ছায়াসঙ্গী। দাদার পরে ছিলেন কাজী আরেফ আহাম্মদ, হাসানুল হক ইনু, পরের সারিতে স্বপনদা, চিশতিভাই, কামাল ভাই এঁরা। এই গ্রুপটা ছিল রাজনৈতিকভাবে উচ্চধারণা সম্পন্ন ছাত্রলীগের প্রগতিশীল অংশ এবং তেমনি জংগী মনোভাবাপন্ন। ৬৯ এ-ই এই গ্রুপটা বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা করতো। এবং সেই লক্ষ্য সামনে নিয়েই আন্দোলন পরিচালিত হতো। আমি ও একদিন কোববাত স্যারকে মুখ ফসকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা বলে ফেলেছিলাম। এই গ্রুপটা ছাত্রলীগের ‘‘নিউক্লিয়ার্স’’ নামে পরিচিত। ‘‘ নিউক্লিয়ার্সে’’ আরো অনেক সিনিয়র নেতারা ছিলেন।

আইয়ুবের পতনের পর ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েই সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্কের (এল এফ ওবিউ) ভেতর ছিল সে নির্বাচন। আমরা লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক বুঝতাম ও না তোয়াক্কা ও করতাম না। একদিন সকালে ইত্তেফাক অফিসে গিয়েছিলাম আবু তাহেরের সাথে দেখা করতে। আবু তাহের পূর্ব পাকিস্থানের প্রথম গল্প সংকলন ''শতদলের'' সম্পাদক সালাউদ্দিন সাহেবের একমাত্র ছেলে। আমার সাথে তার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল । আবু তাহের তখন ঢাকা কলেজে পড়তো এবং ইত্তেফাকে প্রুফ রিডারের চাকুরী করতো।

ইত্তেফাকেই শুনলাম আজ মওদুদীর মিটিং পল্টন ময়দানে। মিটিংয়ে গন্ডগোল হতে পারে। ঐ এলাকায় থমথমে ভাব বিরাজ করছিল। তাড়াতাড়ি বাসায় আসলাম। পেয়ারাবাগে এসেই দেখি শেখ কামাল দাঁড়িয়ে আছেন। পেয়ারাবাগ মোড়ে একটি বৃদ্ধ বাঁকা কাঠাল গাছ ছিল। টয়োটা গাড়ীটি রাস্তায় পার্ক করা ছিল আর শেখ কামাল কাঠাল গাছে হেলান দিতে আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে কামাল ভাই বললেন '' তাড়াতাড়ি রেডি হও মওদুদীর মিটিং বানচাল করতে হবে। সবাইকে বলেছি । তুমি আস কুইক।" শেখ কামাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছেলে সে হিসাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম না। শেখ কামাল সিনিয়র নেতা। তখনকার দিনে সিনিয়র নেতাদের ছিল প্রচন্ড সম্মান ও দাপট।

একদিনের সিনিয়র নেতার হুকুম তামিল করার জন্য আমাদের জান কোরবান ছিল। শেখ কামাল কথা বলতেন কম। কাজ করতেন বেশী। আমি তাকে যতটা সমীহ করতাম তার চেয়ে বেশী ভয় করতাম। নীরবে তাঁকে অনুসরণ করাই ছিল আমার কাজ। গাড়ীতে উঠার আগে পিছনের ডিক্কিতে রাখা অস্ত্র গুলি এক নজর দেখে নিলাম। তখনকার দিনে অস্ত্র বলতে ছিল হকিষ্টিক ও সাইকেল রিকসার চেইন। পল্টনে মওদুদীর মিটিং শুরু হওয়ার সাথে সাথেই আমরা ঝাঁপিয়ে পরে প্রচন্ড মার দিলাম। মিটিং তছনচ হয়ে গেল। আহতরা কাতরাতে লাগলো। আমরা চলে আসতে ছিলাম। কিন্তু কামাল ভাই আমাদের থামালেন। বললেন ''সবাইকে হাসপাতালে নিয়ে চলো।'' হাসপাতালে নেয়ার পথে আহতরা বলতে লাগলো ''ছেড়ে দিন ভাই আমাদের শহীদ হতে দিন'' । আমরা তাদের শহীদ হতে দিলাম না। কামাল ভাইর হুকুমে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম।

দোহার নবাবগঞ্জে তৃণমুল পর্যায়ে তখনো আওয়ামী লীগ গড়ে উঠেনি। যাঁরা আওয়ামী লীগ করতেন তাঁরা ঢাকা ভিত্তিক করতেন। এলাকায় তাঁদের আনাগোনা ছিল খুবই কম। নবাবগঞ্জের হাসেম উকিল ও দোহারের সেরাজ উদ্দিন আহমেদ (সিরাজ মিয়ার) ও শেখ আক্কেল আলীর নেতৃত্বে সংগঠন হিসাবে আওয়ামী লীগ গড়ে উঠেছিল। সিরাজ মিয়া প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও আক্কেল ভাই প্রতিষ্ঠাতা সাধারন সম্পাদক ছিলেন (?) দোহার থানা আওয়ামী লীগের। আমার রাজনৈতিক গুরু আক্কেল ভাই সম্বন্ধে এ নিবন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। সে স্মৃতি অনেক সুখ দুঃখ বিজড়িত আমার নিজেরই জীবন কথা।

সত্তরের এক বাদলা দিনে প্রাক নির্বাচনী প্রচারণায় জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লঞ্চে করে এসেছিলেন জয়পাড়া। তৌহিদুল ইসলাম খান মজলিস (কয়েস) সেদিনের সে ঐতিহাসিক ঘটনার যে মর্মস্পর্শী আবেগমথিত ধারা বর্ণনা দিয়েছিলেন তা আজো আমার কানে বাজে। আন্তজার্তিক খ্যাতি সম্পন্ন আয়কর উপদেষ্টা মরহুম আশরাফ আলী চৌধুরী (মধু চৌধুরী) কে বঙ্গাবন্ধু তাঁর মার কাছ থেকে চেয়ে এনে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

দোহার নবাবগঞ্জ ও কেরানীগঞ্জ থানায় গঠিত পাকিস্তান ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী ঢাকা-১ (?) আসনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মধু চৌধুরীকে নমিনেশন দেয়া হয়েছিল। তিনি এ সিট থেকে এতো বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন যে মুসলীম লীগ প্রার্থী খড়কুটোর মত ভেসে গিয়েছিল। মধু চৌধুরীর

জনপ্রিয়তা এমনই তুঙ্গে উঠেছিল যে, ৭০ এর নির্বাচনে তাঁর প্রাপ্ত ভোট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রাপ্ত ভোটের চেয়ে ও বেশী ছিল। আজ বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দোহার নবাবগঞ্জ কেরানীগঞ্জে আওয়ামী রাজনীতির এই ব্যর্থ করুণ পরিণতির ব্যাপারে আমাদের একটু অতীত বিশেষণ করে আত্মসমালোচনায় ব্রতী হওয়ায় প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে আন্তরিক আহবান জানাই সংশিষ্ট সকলকে। সে সময়ের আওয়ামী লীগের কর্মীরা যদি আজো রাজনীতিতে লেগে থাকতে পারতেন তাহলে হয়তো দোহার থানার আওয়ামী রাজনীতি অন্যরুপ পেতো।

সত্তরে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হওয়ার পর আমি রমনা থানা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য সচিব মনোনীত হই। সত্তরের নির্বাচনে আমাদের ভূমিকা ছিল ব্যাপক। একাত্তরের ২৩ শে মার্চ সম্ভবতঃ আমরাই প্রথম ট্রাকে করে ভ্রাম্যমান গনসংগীতের দল নিয়ে ঢাকা শহর ঘুরেছিলাম। এক দিনের কথা মনে আছে। ইকবাল হলে (সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) প্রচন্ড ঝগড়া চলছে। ঝগড়ার নায়ক আমার বাল্যবন্ধু মোমেন (বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী) মতিঝিল সোনালী ব্যাংক কলোনী এলাকার নির্বাচনী প্রচারণায় প্রাপ্য টাকা শাজাহান সিরাজ ভাই দেননি। মোমেনরা হেভি গোস্বা। রাফিয়া আকতার ডলি আপা মোমেনকে কাছে ডেকে আদর করে নিজ ব্যাগ থেকে টাকা দিয়ে দিলেন। আমার একটা ভুল ধারণা ছিল যে ডলি আপার সাথে শাজাহান সিরাজ ভাইর সম্পর্ক আছে। পরে আমার বন্ধুরা আমার ভুল ভেংগে দিয়ে আকাট মুর্খ বলে আমাকে অনেক ক্ষেপিয়েছে। মগবাজার এলাকা ছিল ছাত্র ইউনিয়নের প্রভাবাধীন। ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপের পরবর্তীকালের সহসভাপতি শহীদ জাহাঙ্গীর ভাই থাকতেন পেয়ারাবাগে।

ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের সিরাজ শিকদার প্রভাবাধীন গ্রুপের শহীদ নয়ন ও থাকতেন পেয়ারাবাগে। ছাত্র ইউনিয়নের এই দুই গ্রুপের ঠেলায় আমরা ছাত্রলীগাররা কোনাঠাসা হয়ে থাকতাম। দুই গ্রুপের সাথেই বিশেষ করে মেনন গ্রুপের সাথে আমার ব্যক্তিগত ভাব ভালবাসা ছিল বেশী। তাই আমরা যখন মগবাজার এলাকায় ছাত্রলীগকে সংগঠিত করার কাজে নামলাম তখন ওরা খুব বেশী বাঁধা দেয় নাই। তাছাড়া সিরাজ শিকদার গ্রুপের ওদের অনেকেই পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি (?) পেয়ারা বাগানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং ২/১ জন করে চলে ও যাচ্ছিল। বরিশালের পেয়ারা বাগানে যাওয়ার অর্থ মৃত্যু গুহায় প্রবেশ করা আর ফিরে না আসা। সম্ভবতঃ এই পেয়ারা বাগান থেকেই সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টির অশুভ অভ্যুদয় হয়েছিল।

২৫শে মার্চ রাত ৮টা পর্যন্ত আমরা লতাদের বাসায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিটিং করেছিলাম। ১০টার দিকে আমরা ক্রাক ডাউনের খবর পাই। আমরা কয়েকজন পায়ে হেটে রওনা দিয়েছিলাম ৩২ নম্বরের দিকে। ইস্কাটন গার্ডেনের কাছে অভিনেতা হাসান ইমাম আমাদের থামালেন। বললেন ''রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে তোল''। মগবাজার রুবি ক্লিনিকের সামনের রাস্তায় হাসান ইমামসহ আমরা ব্যারিকেড তৈরি শুরু করলাম। ২৫শে মার্চের কালোরাত্রিতে কোথা থেকে কি শুরু হলো কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই দেখলাম পাক মটর (বাংলা মটর) থেকে ঘড় ঘড় করে ট্যাংক আসছে। রকেট ল্যান্সারের আলোতে সব ফরসা হয়ে যাচ্ছে। ট্যাংক বহর মগবাজারের কাছাকাছি আসতেই আমরা ভেগে গেলাম।

যদি ও তখন আমরা মলোটভ ককটেল বানানো শিখে গেছি। তখন সে কথা আমাদের মনেও ছিলনা এবং সেরকম প্রস্তুতি ও ছিলনা। মগবাজারের রেল লাইন পার হয়ে পেয়ারাবাগের ভেতর সাধারণত পুলিশ বা আর্মি ঢুকতো না। কার্ফুর সময় ও পেয়ারাবাগের ভেতর লোক চলাচলে অসুবিধা হতো না। গোলাগুলি শুরু হওয়ার সাথে সাথেই আমরা ছাদে গিয়েছিলাম। কিন্তু টিকতে না পেরে ঘরের ভিতর খাটের তলায় আশ্রয় নিয়ে ছিলাম। সারারাত মশার কামড় খেয়ে একাত্তরে ২৫শে মার্চের কালোরাত্রি পার করেছিলাম। ২৬শে মার্চ সকালে আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি। সবাই পেয়ারাবাগ মোড়ে জমায়েত

হওয়ার পর দেখলাম আমাদের এক প্রিয় মানুষ যাঁকে আমরা ''নানা'' বলে ডাকতাম তিনি নেই। সম্ভবতঃ তার নাম ছিল ওস্তাদ আলাউদ্দিন (?) বাড়ি বগুড়া। কাজ করতেন ডেইলি পিপলসে প্রুফ রিডারের। তিনি ''জলছবি'' নামক একটি সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন এবং আঞ্জুমান আরা বেগমকে ছোট বেলায় গান শিখাতেন। আমরা মনে করলাম নানার খোঁজ নেয়া দরকার। জোর করেই আমিও আজাদ একটি রিক্সায় চেপে বসলাম।

ইস্কাটন ও বেইলী রোড হয়ে তৎকালীন হোটেল ইন্টারকন পর্যন্ত ভালই গেলাম। ইন্টারকনের সামনে ডেইলি পিপলসে ঢোকার মুখেই দেখি লাশ আর লাশ। লাশের পাহাড়। ডেইলি পিপলস অফিস ভষ্মিভূত হয়ে গেছে। নানা আর বেঁচে নেই। এ ধারনা নিয়েই আমরা তাড়াতাড়ি মগবাজার ফিরে এলাম। সেই নানা ৭২ এর এক সকালে নানা উদয় হলেন খালাকে সাথে নিয়ে। নানার ছোট মেয়ে যিনি বগুড়া থেকে ঢাকা এসে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য। আমরা হাসবো না কাঁদবো। কিছু বুঝে উঠার আগেই ভয়ঙ্কর সুন্দরী প্রায় সমবয়সী খালার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে নানাকে ছেড়ে খালাকে নিয়ে মেতে উঠলাম। ২৭শে মার্চ কার্ফ্যু শুরু হলো। সম্ভবতঃ একদিন পরে কার্ফ্যু কয়েক ঘন্টার জন্য শিথিল করা হয়েছিল।

ঐ সুযোগে সবাই ঢাকা ছেড়ে পালাতে লাগলেন। আজাদদের ফ্যামিলি ঘোড়াশাল পাঠাতে হবে। কিন্তু কি করে? ভেবে কোন কূল কিনারা পাওয়া যাচ্ছে না। একটি বেবি টেক্সি পাওয়া গেল কিন্তু ডিজেল নেই। আমরা ডিজেল সংগ্রহ করে দেব এই শর্তে বেবীওয়ালা রাজী হলেন ওদের ডেমরা নিয়ে শীতলক্ষায় লঞ্চে বা নৌকায় তুলে দিতে। আমরা মগবাজার মডার্ন মটরস থেকে ডিজেল নিয়ে এলাম। ওদের বেবীতে তুলে দেয়ার কিছুক্ষণ পরই শুনতে পেলাম ইষ্টার্ন ব্যাংকিং করপোরেশনের এম ডি হামিদ উলাহ সাহেবের (পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনর) ফ্যামিলি নৌকায় যাচ্ছিল পাক আর্মি সে নৌকায় ব্রাশ ফায়ার করে সবাইকে মেরে ফেলেছে।

পেয়ারাবাগ মসজিদের পাশে যেখানে আমরা বসতাম সেখানে একটি বড় বাঁশের ডগায় ২৩শে মার্চ আমরা বাংলাদেশের পতাকা তুলে ছিলাম। কিন্তু ২৫শে মার্চ ক্রাক ডাউনের পরও আমরা সে পতাকা নামাইনি। মহলার মুরব্বিরা চাপ দিতে লাগলেন পতাকা নামানোর জন্য। কিন্তু আমি কিছুতেই রাজী হচ্ছিলাম না। ''আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ''। আবুল মনসুর আহমদের লেখা এই বইটা ছিল আমার কাছে। আজাদ তা মাটিতে পুতেঁ ফেললো। মহলায় কোন লোক ছিল না। আমরা একান্ত বাধ্য না হলে ঘর থেকে বের হতাম না। মহলায় সব মুরগী আমাদের বাসায় আসতো। আমরা চাল খাওয়াতাম। আর একটা একটা ধরে জবাই করে নিজেরা খেতাম। ভালই চলছিল।

আমি একদিন গিয়ে ছিলাম সিদ্ধেশ্বরী। হেঁটে হেঁটে আসার পথে ভিখারুন্নেছা নুন স্কুল পার হয়ে রমনা থানা বাম পাশে রেখে সাদেকুর রহমান উকিলের বাড়ির (হাইস্পীড নেভিগেশনের মালিক) কাছে আসতেই কোথা থেকে একটি ছেলে দৌড়ে এসে আমাকে বললো ''হাবিব ভাই পেয়ারাবাগে যাবেন না। বিহারী ছেলেরা (নন বেঙ্গালী) ঘুরে ঘুরে আপনাদের নামের লিষ্ট বানাচ্ছে। কয়েকজনকে রমনা থানায় ধরে ও এনেছে। আমাদের বেশ কিছু অবাঙ্গালী বন্ধু ছিল। ওরা ই-এ কাজ করেছে তা বেশ বুঝতে পারলাম। যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছিলাম তার একটু সামনে ডান দিকে একটু এগুলেই মগবাজার কাজী অফিস। আরো একটু সামনে গোলাম আজমের বাড়ি। রমনা থানা হাজতের পিছনে বেশ জংগল মত ছিল।

আমরা দু'জন সে জংগলের ভেতর গিয়ে জানালায় উঁকি দিয়ে দেখলাম হাজতের মধ্যে আমাদের অনেকগুলি ছেলে। পাকিস্তানী আর্মির জলাদেরা হাজতের মোটা মোটা লোহার শিকের সাথে পেঁচিয়ে

ছেলেগুলির হাত পা ভাংগছে মট্ মট্ করে। এ দৃশ্য আমরা বেশীক্ষন দেখতে পারলাম না । সরে এলাম ওখান থেকে। সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম আর ঢাকা থাকা চলবে না। পরদিন সকালবেলা আমি আজাদ ও খোরশেদ আজাদদের গ্রামের বাড়ী পলাশের দিকে রওনা দিলাম। তখনো আমি বাংলাদেশের পতাকা নামাইনি। রেল লাইন ধরে হাঁটছি। আমাদের সাথে যোগ দিলেন সিনেমার তৎকালীন জনপ্রিয় কৌতুকাভিনেতা চাঁদ প্রবাসী। তার থমথমে মুখের দিকে চেয়ে আমরা দুষ্টুমী করার লোভ সংবরণ করলাম।

রাতের বেলা আমরা আশ্রয় পেলাম কাঞ্চন হাই স্কুলে। মহিলারা একদিকে। পুরুষরা অন্য দিকে। ঐ গ্রামের লোকজন রাতে আমাদের খিচুরি দিয়ে আপ্যায়িত করেছিলেন। আমরা তাস খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করলে স্কুলের কিছু ছাত্র আমাদের তাসের যোগাড় করে দিয়েছিল। সারারাত আমরা তাস পিটিয়ে ছিলাম। সকালে রওয়ানা দিয়ে দুপুরের দিকে আমরা ঘোড়াশাল পৌঁছি। তারপর পলাশ।

ঘোড়াশাল রেলওয়ে ব্রীজের নীচে ইস্ট বেঙ্গাল রেজিমেন্টের ২০/৩০ জনের একটি গ্রুপের সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল। প্রাণের ভয়ে ভীত এ জোয়ানদের চেহারায় ছিল হতাশা। ঐ লোকগুলি রাজনৈতিকভাবে মটিভেটেড ছিল না। ২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে পিলখানার ইপিআর ব্যারাকে পাকিস্তান আর্মির অর্তকিত আক্রমনের ভয়াবহতাই তাদের মুক্তিযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আমরা ক'দিন ঘোড়াশাল থেকে স্থানীয় ছাত্রদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার চেষ্টা করি। কিন্তু যেদিন নরসিংদী কলেজের উপর পেন থেকে বোমা ফেলা হয় (ভাগ্যিস বোমাটি কলেজে না পড়ে কলেজ পুকুরে পড়েছিল) সেদিনই আমরা স্থির করি আর এখানে নয় ঢাকা যাবো। লঞ্চে করে শীতলক্ষা নদী দিয়ে আমরা ঢাকা চলে আসি।

আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আমার বাপ মা, ভাইবোনের কথা, আমার দেশগ্রাম, ঘরবাড়ির কথা। বাসায় এসে আমার রুমের দরজায় দেখি বাবা একটি চিঠি লিখে দরজার সেটে রেখে গেছেন। ''যদি তুমি বেঁচে থাক অতি সত্বর বাড়ি আস তোমার মা শয্যাশায়ী''। বাবার দীর্ঘ চিঠিতে পুত্র শোকাতুর একজন পিতার সব হারাণোর হাহাকার মুর্ত হয়ে উঠেছিল। তখন বুঝিনি। আজ বুঝি কি দুঃসহ বেদনা নিয়ে আমার বাবা ঢাকা এসেছিলেন এবং ছেলেকে না পেয়ে নিঃস্বতার কি দুঃসহ বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। আমি তখনই বাড়ি যাওয়ার জন্য রওয়ানা দেই। কিন্তু আজাদ আমার পিছু ছাড়লো না। সেও আমার সাথে চললো।

পাকি মিলিটারীরা যেদিন জিঞ্জিরায় আগুন লাগিয়ে সব জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেই হাবিয়া দোযখের আগুনে বুড়িগঙ্গা পার হয়ে আসা লাখো ঢাকাবাসী (যার মধ্যে সংখ্যালঘুই বেশী) আশ্রয় নিয়েছিল জিঞ্জিরায়। সেই লেলিহান আগুনে ভস্মিভূত ঘরবাড়ির চেয়ে আশরাফুল মাখলুকাত আদম সন্তানই মরে ছিল বেশী। আমাদের বাড়ি যাওয়ার রাস্তা নদী পার হয়ে জিঞ্জিরা দিয়ে। এই রাস্তার কোন বিকল্প ছিল না। ডাঃ অখিল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। যিনি আমার বাবার বাল্যবন্ধু ও আমাদের পারিবারিক ডাক্তার। আমরা তাঁকে কাকা ডাকতাম। জিঞ্জিরা জ্বলে পুড়ে খাক হওয়ার পর তিনি বাড়ি পৌঁছেন।

পৌঁছে তিনি খবর রটিয়ে দেন ''হাবিব জিঞ্জিরায় পুড়ে মারা গেছে। আমি নিজে দেখে এসেছি।'' খবরটা অতিদ্রুত আমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সাদাপুর থেকে আমার ফুফুরা ছুটে আসেন। মানিকগঞ্জের বড়লা থেকে আমার জ্ঞাতি কাকারা ছুটে আসেন। দেশে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ পাকিদের দ্বারা খুন হচ্ছে। লাখো মানুষ ভিটে মাটি ছাড়া হচ্ছে সেখানে এ ধরণের একটা তুচ্ছ খবর এলাকাবাসীর মনে কোন শোকের আবহ সৃষ্টি করতে পারে নাই। কিন্তু আমার বাবা মা ? তাঁদের প্রবোধ দেবে কে? কোত্থেকে পাবে তাঁরা সান্ত্বনা? তাই বাবা ঠিক করলেন ঢাকা যেয়ে নিজ চোখে সব দেখে

আসবেন। তখন ঢাকা যাওয়া মানেই ছিল মৃত্যুকূপে ঝাঁপ দেয়া। বাবা ঢাকা গেলেন এবং বিফল মনোরথ হয়ে শূন্য হাতে ফিরে এলেন। এরকম পারিবারিক শোকাবহ পরিবেশে আমি ফিরে এলাম বাড়ীতে সাথে বন্ধু। বড় দিঘিতে ছোট্ট একটা ঢিল পড়লে যতটুকু ঢেউয়ের কম্পন হয়। ততটুকু হয়তো হয়েছিল। আমার ফিরে আসতে কিন্তু লাখো নারী পুরুষের সব ছেড়ে দেশান্তরী হওয়ার গণমিছিলে গোঁদের উপর বিষ ফোঁড়ার মত ছিল হিন্দুদের ঘরবাড়ী মাল-সামান লুটপাটের মহোৎসব।

এই ডামাডোলে কে কার খবর রাখে। কিন্তু আমার সন্ধান ছিল অন্যত্র। তখনও মুক্তিবাহিনী সংগঠিত হয়নি। প্রক্রিয়া চলছে গোপনে। গোপনে গোপনে খুঁজতে থাকলাম সিরাজ মিয়া সাহেব কোথায় আছেন? পরবর্তীকালে তিনি হলেন আমাদের "ছোট হুজুর"।

আমার বাড়ী ঢাকা জেলার দোহার থানার রাইপাড়া ইউনিয়নের পালামগঞ্জ গ্রামে। সিরাজ মিয়া সাহেব যিনি দীর্ঘ ২৪ বছর রাইপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা মরহুম হাফিজ উদ্দিন আহমেদ ছিলেন আইয়ুব আমলের ডাক সাইটে কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রী। তাঁর অন্যান্য ভায়েরা ও বড় মাপের আমলা ছিলেন। তার এক ভাগ্নে ক্যাপ্টেন নূরুল হক জিয়া সরকারের আমলে নৌ পরিবহন মন্ত্রী ছিলেন। প্রকাশক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মফিদুল হক তাঁদের আত্মীয়। সিরাজ মিয়া সাহেব আমার বাবার বাল্যবন্ধু ছিলেন। তিনি আমাকে অত্যাধিক স্নেহ করতেন। ততোধিক বিশ্বাস করতেন ।

আজো আমি তার বিশ্বাসের মর্যাদা রেখে চলছি। সিরাজ মিয়া ছিলেন দোহার থানা মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার। জিঞ্জিরা ম্যাসাকারের পরে বেচেঁ যাওয়া এক দংগল হিন্দু মেয়ে যারা অসহায়ভাবে ইন্ডিয়া যাওয়ার প্রতিক্ষা করছিল। ঘটনাচক্রে সংকট যখন প্রকট আকার ধারণ করল আমি তখন এদের সাথে জড়িয়ে গেলাম। প্রথম দিকে যদিও আমি ইনভলভ ছিলাম না। এ ঘটনা বলার আগে একটু ভুগোল বর্ণনা করা দরকার। ঢাকা শহর বাদ দিয়ে দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই থানা নিয়ে ঢাকা জেলা গঠিত। মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান, শ্রীনগর ও মানিকগঞ্জের হরিরামপুর থানা সহ দোহার নবাবগঞ্জ কেরানীগঞ্জ অপেক্ষাকৃত নীচু অঞ্চল। বিখ্যাত আঁড়িয়াল বিল এ অঞ্চলে অবস্থিত।

হরিরামপুর দোহার ও নবাবগঞ্জের মধ্যে আছে কোঠাবাড়ির চক। নদীনালা খালবিল ঝিলের ঝিক্‌ঝাক নৌপথ ও হাঁটাপথ দিয়ে এ সমস্ত এলাকা থেকে ঢাকা যেতে আসতে সময় লাগতো প্রায় ৬/৭ ঘন্টা। যদি ও ঢাকা থেকে আমাদের এলাকার দুরত্ব ২৪/২৫ মাইলের বেশী হবে না। বর্ষা শুরুর আগেই সম্ভবতঃ এপ্রিল বা মের প্রথম দিকে দোহার নবাবগঞ্জে পাকি মিলিটারী আসে। প্রথম এক দু সপ্তাহ চুপচাপ থাকার পর শুরু হয় হিন্দু নিধনযজ্ঞ। কলাকোপা বাগমারা এলাকায় প্রচুর হিন্দুর বাস ছিল। আর আমাদের এলাকায় হিন্দু মুসলিম ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সম্প্রীতিরসহ অবস্থান বৃটিশ জমানা থেকে। কিন্তু পাক আর্মি আসার সাথে সাথেই উল্টা বাতাস বইতে শুরু করলো। হিন্দু মারকাট খাও। এ অবস্থায় লাইন ধরে হিন্দু পুরুষ মারা শুরু হলো। আর দঁড়িতে বাঁধা লাশের ভেলা ভাসতে থাকলো ইছামতি নদীতে। হিন্দু মেয়েরা হলো পাকি জানোয়ারদের ধর্ষনের বলি। যারা বাঁচলো তারা আশ্রয় নিল নদীতে নৌকায় বা সোলা পাতিলঝাঁপ তুইতাল ছাড়িয়ে বিস্তীর্ন ধান ও পাট ক্ষেতের মধ্যে। বর্ষার শুরুতেই এই সব ছিন্নমুল অসহায় মেয়েরা আশ্রয় পেলো নৌকায়। ধীরে ধীরে চৌদ্দ পুরুষের ভিটার মায়া ছেড়ে পাড়ি দিতে লাগলো ইন্ডিয়ায়। এদেঁর সাথে যোগ হলো পূর্বে উলেখিত পুরাণো ঢাকায় হিন্দু মেয়েরা।

মোটা দঁড়িতে পিছমোড়া করে বেঁধে ইছামতির পাড়ে লাইন ধরে দাঁড় করানো হতো হিন্দু পুরুষদের। ষ্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারের পর লাশ পড়তো নদীতে। রুজ্জু বাঁধা লাশের মধ্য থেকে একটি লাশ নড়ে চড়ে উঠলো। ঝাপাঁঝাঁপি শুরু করলো পানিতে। কেরাইয়া নৌকার মাঝিরা তাকে উদ্ধার করলো। পায়ে গুলি লেগেছিল তাই বেঁচে গেছে। এই আহত লোকটি লীলাবতী সাহার বাবা। অবিবাহিতা লীলাবতী সাহা

বয়সে আমাদের বড় ছিলেন। তাই আমরা তাকে দিদি ডাকতাম। বেঁচে তো গেলেন লীলাদির বাবা। কিন্তু কিছু দিন পরই ক্ষতস্থানে গ্যাংগরিন হয়ে পচঁন ধরলো। নদীতে কুমীর ছিল না। ছিল আশ্রয়। কিন্তু পাড়ে উঠলেই পাকিস্তানী মিলিটারীর উচাঁনো বন্দুকের নল।

বর্ষায় টইটম্বুর বিস্তীর্ন জলাভূমি। চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই নেই। নবাবগঞ্জের সফি ডাক্তার এবং পোদ্দার বাজারের ক্যাপ্টেন কালিপদ ছাড়া এমবিবিএস ডাক্তার এ তলাটে আর নেই। তবু টুটকা চিকিৎসা চললো। তার সাথে চললো লীলাদির ফুফাঁনো কান্না।

বর্ষার স্রোতের টানে ও বাতাসের ধাক্কায় ধানের গোড়া আলগা হয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলে যেতো। আমন ধানের ক্ষেতকে ক্ষেত এভাবে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে কোঠাবাড়ির চকের মাঝখানটা ঘোলা জলের সাদা রংয়ের সাগরের মত দেখাতো। অনির্ধারিতভাবেই ওখানে মুক্তিবাহিনীর ভাসমান ক্যাম্প সৃষ্টি হয়ে গেল। মুক্তি বাহিনীর এ ধরণের ভাসমান ক্যাম্প বাংলাদেশের অন্য কোথাও ছিল বলে আমার জানা নেই। হিন্দু পরিবারগুলি ও আস্তে আস্তে ওখানে এসে ভীড় জমাতে লাগলো। কৃষকরা ডিঙ্গি নৌকায় করে চালডাল নুনতেল ও জেলেরা মাছ দিয়ে যেতো।

বর্ষার এ সময়টায় যুদ্ধের তৎপরতা কিছুটা স্তিমিত হয়ে গেল। কিন্তু ইন্ডিয়ায় যাওয়ার প্রবনতা বৃদ্ধি পেলো। ছোট হুজুর ও আক্কেল ভাইর ব্যবস্থাপনায় এবং রব মান্নান ও হাই ভাইয়ের তড়িৎ তত্ত্বাবধানে মুক্তিবাহিনীর গ্রুপগুলি একে একে মেলাঘর ক্যাম্পে পোঁছিতে লাগলো সাথে সাথে হিন্দুরাও। নয়নশ্রী গ্রামে দীপালী শেফালী নামে দুটি তেজস্বিনী মেয়ে ছিল। এ দু বোন মিলে মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ করে ছিন্নমুল হিন্দু পরিবারগুলিকে যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করেছিল।

বর্ষার কোঠাবাড়ির চক। পাশ দিয়ে বয়ে চলছে ইছামতি। অনতি দুরে প্রমত্তা পদ্মা। বিস্তীর্ন এলাকা পানিতে প্লাবিত। ধান গাছগুলি পানির সাথে পালা দিয়ে লম্বা হচ্ছে। গলা ডুবিয়ে পাট গাছগুলি ধানের সাথে হেলেদুলে সখ্যতা প্রকাশ করছে। গলাগলি মিলনে আমরা ছোট ডিঙ্গা নৌকা নিয়ে গভীর রাতে প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদন করছি। একদিকের নৌকাগুলিতে মেয়েরা অন্যদিকের নৌকা গুলিতে ছেলেরা। নিথর শ্রাবণে পদ্মার ঘোলাজলের উপর কোজাগরী পুর্ণিমার রাতে এক আলোছায়ায় মায়াবী খেলা সমস্ত অঞ্চলটিকে যেন মৌন স্তব্ধ করে দিয়েছে। দুরের গলাডুবা সবুজ গ্রামগুলি থেকে দু একটা নিশাচর পেঁচার ডাক। তারপরই কুকুরের ঘেউ ঘেউ রাতের নিস্তব্ধাকে ভেংগে দিচ্ছে।

তারই রেশ যেন নিথর পানিতে মৃদু ঢেউ তুলছে। আমিও আজাদ ডিঙ্গার দু গুলইতে বসে আছি। ছলাৎ ছলাৎ একটি নৌকা কাছে এসে মেয়েলী হাঁক দিতেই আমরা তাদের আসতে বললাম। দেখি খুকু হাসুদি ও মনি তিন বোন। একদিনে ওরা বেশ নৌকা বাইতে শিখে গেছে। ছলাৎ ছলাৎ বৈঠা বেয়ে ওরা আমাদের নৌকার সাথে ওদের নৌকা বেঁধে দিল। একাত্তরের দুঃসময়ে ওদের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। নারিন্দা, দয়াগঞ্জ ও দক্ষিন মৈশন্ডির অনেকগুলি হিন্দু পরিবারের সাথে তখন দেখা হয়েছিল। কিন্তু খুকুদের সাথে আমার বন্ধুত্ব আজো সেই নৌকা বাঁধার মতই অটুট আছে। এ বয়সে ও ওদের পরিবারের সাথে আমাদের পরিবারের সৌহার্দ্যের কমতি ঘটে নাই। ঘুমহীন রাত গভীর হতে থাকলো আমাদের আড্ডা জমে উঠলো। লীলাদির বাবার পায়ের পচঁন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। পচাঁ মাংসের গন্ধে টেকা দায়। ওদের এ কথায় বোবা ব্যথা নিয়ে তাকিয়ে রইলাম নৌকাগুলির দিকে। কেউ কেউ চাইছে লীলাদির বাবাকে পানিতে ফেলে দিতে।

ছোট হুজুরের কড়া হুকুম যে করেই হোক তাকে বাচাঁতে হবে। ডাক্তারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে শীঘ্রই। আজাদের কথায় আমরা আশ্বস্ত হলাম। নৌকা থেকে লীলাদির করুণ বিলাপ ভেসে আসছে। আমরা এই

অসহ্য দহন জ্বালা আর সইতে পারছিলাম না। হাসুদিকে বললাম গান ধরতে। ঢাকা মিউজিক কলেজের ১ম বর্ষের ছাত্রী হাসুদি নজরুল সঙ্গীতে পড়াশুনা করছে। হাসুদি গুনগুনিয়ে গান ধরলো। আমরা আরো কাছাকাছি হলাম। মাঝে মাঝে আমরা নৌকা ছেড়ে ডাঙ্গায় চলে আসতাম। একদিন রেকি করার নাম করে আমিও তাপস বেরিয়ে পড়লাম।

গভীর রাতে আমরা পালামগঞ্জ এলাম। বাড়ি এসে দেখি অপরিচিত দুটি মেয়ে। মাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম। গোমেজ সাহেবের স্ত্রী ও দুটো মেয়ে এসেছে ঢাকা থেকে । মিঃ গোমেজ তৎকালীন দৈনিক মর্নিংনিউজের ম্যানেজার ছিলেন। আমাদের বাড়ির কাছেই তাঁর গ্রামের বাড়ী ছিল। এখন সেখানে কেউ থাকেনা। ছাড়াবাড়ি। উনারা ঢাকা থাকেন। বাবার বাল্যবন্ধু। এখনো সম্পর্ক অটুট আছে। বাবা ঢাকা গেলে উনাদের বাসায় যান। কিন্তু মেয়ে দুটির পরিচয় মা দিতে পারলেন না। পরে বাবার কাছে জেনেছিলাম। মেয়ে দুটি ছিল বিহারী । অবাঙ্গালী মেয়ে। ওদের মা বাবাকে মেরে ফেলা হয়েছে। অসহায় এ মেয়ে দুটি গোমেজ সাহেবের বাসায় আশ্রয় নিয়ে ছিল। দুটি বিবাহযোগ্যা অবাঙ্গালী মেয়েকে নিয়ে ঢাকায় থাকা নিরাপদ নয় বিধায় গোমেজ সাহেবের স্ত্রী নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে আমাদের বাড়ী এসে উঠেছেন।

আমার বাবা তাদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং এ আশ্বাস ও দিয়েছেন যে, যতদিন খুশী তারা এখানে থাকতে পারে কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। আমি পরে আরো দু একবার বাড়ি গিয়ে মেয়ে দুটিকে দেখেছি কিন্তু কোন কথা হয়নি। ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা আমাদের বাড়ীতে ছিল। শীতের শুরুতেই আমার মা ঘরের সমস্ত লেপকাঁথা লক্ষীপ্রসাদ মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ডিসেম্বরের নিদারুণ শীতের কষ্ট সহ্য করেও তারা আমাদের বাড়ি ছিলেন। জানুয়ারীর প্রথম দিকে চলে যান। পরে তাদের আর কোন খবর পাইনি। হয়তো বাবা পেয়েছিলেন। আমি ও তাপস প্রায়ই বেরিয়ে পড়তাম।

গভীর রাতে কোথাও চারটি খেয়ে নিয়ে গাছ তলায় ঘুমাতাম। পালামগঞ্জ, কাচারিঘাট, হাসনাবাদ, বান্দুরা প্রভৃতি এলাকাগুলি ছিল মুক্তাঞ্চল। মুক্তিবাহিনীর দখলে। কাচারীঘাটের সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ঐতিহাসিক ছবি বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। ঐ ছবিটা দিয়ে অনেক পোস্টার ও তৈরি হয়েছে। পালামগঞ্জের বিশাল বট গাছের নীচে এক রাতে আমরা শোয়ার ব্যবস্থা করেছি। লুঙ্গি খুলে গলা পর্যন্ত টেনে হাত মাথার নীচে দিয়ে গাছ তলায় কিভাবে ঘুমুতে হয় তাপস আমাকে সে জ্ঞান দিল। তাপস ভাল রবীন্দ্রসংগীত গাইতো। ওকে অনুরোধ করলাম একটি গানের জন্য। ও গান ধরলো। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালের কচিসূর্য আমার চোখে চুমু দিতেই ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। তাপস তখনো বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। ওকে ঠেলা দিয়ে তুলতেই বললো '' রাতে সাপের ওৎপাতে ঘুমুতে পারিনি ''। "কি ! সাপ বেরিয়ে ছিল ? কোথায় ? "ঐ বট গাছটির খোরলে অনেক খড়ি ও চন্দ্র বোরা সাপের বাস ছিল। কথাটা আমি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম । আমাকে ধাক্কা দিয়ে তাপস বললো '' ''আরে বোকা বর্ষায় সাপ বেরুবে না তো কি কেঁচো বেরুবে। চল''। তাপস এখন কোলকাতায়।

কয়েক বছর আগে দেশে এসেছিল। বুলবুলদের ওখানে উঠেছিল। আমাকে খুঁজে ছিল। আমি ও তখন দেশে ছিলাম। খবরটা দেরীতে পাওয়াতে ওর সাথে আর দেখা হয়নি। লক্ষীপ্রাসাদ, কাছারিঘাট ও ইকরাশি। ইছামতি তীরের এ এলাকাজুড়ে গড়ে উঠেছিল একটি বিরাট মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প পোদ্দার বাড়ির দোতালা পুরোণো বিল্ডিংকে ঘিরে। ডাঃ আব্দুল আউয়াল। যিনি আউয়াল ডাক্তার নামে এলাকায় সমধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন ঐ এলাকায় মুক্তিবাহিনীর অন্যতম প্রধান সংগঠক। দোহার থানা হেড কোয়ার্টার

জয়পাড়ায় অবস্থিত। জয়পাড়া থেকে নটাখোলার শেষ মাথায় খালের পাড়ে বর্তমানে যে জায়গাটি ''বাঁশতলা'' নামে পরিচিত। সেইখানে অবস্থান নিত পাকিস্তানী আর্মি। আর মুক্তিবাহিনীর অবস্থান ছিল পালামগঞ্জ বাজারে। মাঝখানে বিরাট কূম (দীর্ঘ বড় গভীর জলাশয়) আশপাশে ক্ষেতখামার। আউয়াল ডাক্তারের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তো সেই যুদ্ধক্ষেত্রে।

বর্তমানে রিয়াদ প্রবাসী সফিউদ্দিন (পর) জাহাঙ্গীর, আলাউদ্দিন এঁরা ছিল অসীমসাহসী মুক্তিযোদ্ধা। দুই পক্ষের গোলাগুলিতে পালাগঞ্জ গ্রামবাসীর নাভিশ্বাস উঠতো। আমাদের বাড়িতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়তো। পুরুষরা গ্রাম ছাড়া দীর্ঘদিন। মহিলা ও শিশুরা যুদ্ধ শুরু হলেই উত্তর চকের গলাডুবা পানিতে শুধু নাক উঁচু করে পাটক্ষেতের ভেতর লুকিয়ে থাকতো। আমার মেঝো কাকার বড় মেয়ে ফিরোজা দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিল। তখন তার বয়স ১২/১৩ হবে। আমার ছোট ভাই ফজলু ফিরোজাকে কাঁধে করে দৌড়ে সবার সাথে পাটক্ষেতে আশ্রয় নিত। এটা ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। অসুখ বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেলেও চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থা ছিল না।

একদিন যুদ্ধের দামামা বেঁজে উঠতেই সবাই দৌড়ে নিজ নিজ আশ্রয় খোঁজে নিল। কিন্তু ফিরোজাকে নিয়ে যাওয়া ছিল মুস্কিল। আবার ঝাঁক ঝাঁক গুলি আমাদের ঘরের টীনের বেড়া ফুটো করে ভেতরে ঢুকতো। এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে ফজলু কোন মতে টেনেহিচঁড়ে ফিরোজাকে নিয়ে পাটক্ষেতে পালালো। নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছাঁর পর দেখা গেল ফিরোজা আর বেচেঁ নেই। হয়তো ভয়ে হার্টফেল করেছিল কিংবা গুলি লেগে মারা গিয়েছিল। এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছিল সকালের দিকে। সারাদিন মৃত বোনকে বুকে আগলে বসেছিল ফজলু। সন্ধ্যার দিকে যুদ্ধ থামলে বাড়িতে এনে ফিরোজাকে দাফন করা হয়েছিল। একান্ত ব্যক্তিগত বলে এ ঘটনার বিবরণ দেয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের ভয়াবহতা ও রণক্ষেত্রে পালমগঞ্জ গ্রামবাসীর অসহায়ত্বের কাহিনী লিপিবদ্ধ থাকা উচিত মনে করেই সংক্ষেপে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম।

লেখাটা অনেক দীর্ঘ হয়ে গেল। গুটিয়ে আনা দরকার। লেখার এই পর্যায়ে এসে একটি মুখ আমার চোখের সামনে ভাসছে। আমি কখনো পাকিস্তানে যাইনি। তাই বলতে পারবো না ছেলেটি কোন প্রদেশের বালুচি, পাঠান, সিন্ধী না কাশ্মিরী। তবে দীর্ঘদিন পাকিস্তানীদের সাথে ঘনিষ্টভাবে মেলা মেশাতে মনে হচ্ছে ছেলেটি বোধ হয় বালুচি ছিল। যুদ্ধের শেষের দিকে বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানী মিলিশিয়া বাহিনী নামানো হয়েছিল। অল্প বয়সী ছেলেদের নিয়ে মিলিশিয়া বাহিনী গঠিত হয়েছিল। সামান্য ট্রেনিং দিয়েই এদের ''কাফের'' মারতে পাঠিয়ে দেয়া হতো বাংলাদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে।

ওরা এ দেশে এসে অন্য চিত্র দেখতো। দেখতো সবাই মুসলমান এবং ওদের চেয়ে ভাল মুসলমান। যুদ্ধ শেষে ছেলেটি ধরা পড়েছিল মুক্তিবাহিনীর হাতে। ওদের সবাই চলে গিয়েছিল কিন্তু ছেলেটি বন্দী ছিল কলাকোপায় শম্ভু বাবুর বাড়ির ক্যাম্পে। পাকিস্তানী আর্মির নারী নির্যাতনের যে কাহিনী চালু আছে। তার জন্য কতটা পাকিস্থানী আর্মি দায়ী আর কতটা রাজাকার আলবদর দায়ী। তা নতুন করে ভেবে দেখার অবকাশ আছে। দোহার থানায় পাকিস্তান আর্মির তৎপরতা পুরো যুদ্ধের সময়টায় ভয়ানক পর্যায়ে ছিল না। কিন্তু দোহার থানা দখলের পর আর্মিদের ব্যাংকারে প্রচুর পরিমান শাড়ি, বাউজ ও ছায়ার টুকরো পাওয়া গিয়েছিল। কোন মেয়ে পাওয়া যায়নি। কারা ওদের মেয়ে সাপাই দিয়ে পাকিস্তানীদের খুশী করার চেষ্টা করে ছিল?

এ দীর্ঘ স্মৃতিচারণে একবার ও ২৭শে মার্চ না ২৬শে মার্চ না ২৫শে মার্চ কে কখন স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন সে প্রসংগে আসেনি। যারা ৬৯ এর ১১ দফা আন্দোলন থেকে ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত জড়িত

ছিলেন তাদের কাছে এ প্রসংগটা অবান্তর। অবান্তর এই কারণে ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্টতা পাওয়ার পর স্বাভাবিক নিয়মেই পাকিস্তান পার্লামেন্টের নেতা নির্বচিত হবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ঢাকায় পার্লামেন্টের অধিবেশন বসবে এটাই নিশ্চিত। ইয়াহিয়া খান সে মর্মে ঘোষণা ও দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন ঢাকায় পার্লামেন্টের অধিবেশন বসা স্থগিত করা হলো।

তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঢাকায় ছাত্র জনতা রাস্তায় নেমে এসেছিল। ষ্টেডিয়ামে তখন এমসিসি বনাম পাকিস্তান ক্রিকেট দলের খেলা চলছিল। খেলা বন্ধ হয়ে গেল। গুলিস্তানের কামানের উপর দাঁড়িয়ে অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম ভাষনটি দিলেন। সে জ্বালাময়ী ভাষনে সমস্ত দর্শক শ্রোতা তখনই পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলো। হোটেল পুর্বানীতে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠক চলছিল। তোফায়েল আহমদের (?) নেতৃত্বে মিছিল করে ছাত্র জনতা বঙ্গবন্ধুর কাছে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের দাবী জানালো। সে মিছিলের শোগান ছিল- 'পিন্ডি না ঢাকা - ঢাকা - ঢাকা,' 'তোমার আমার ঠিকানা- পদ্মা মেঘনা যমুনা' 'বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর- বাংলাদেশ স্বাধীন কর'।

বস্তুতঃ ১৯৭১ সনের ১ মার্চে ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ঢাকায় পাকিস্তান নবনির্বাচিত পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার অব্যবহিত পরই তথাকথিত পুর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নাম ধারণ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ৭ই মার্চের রেসকোর্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পর নতুন করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। বস্তুতঃ তৎকালীন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ ৭ই মার্চের ভাষণের পর নিজ নিজ দায়িত্বেই নিজেদের মত করে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তখন মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, ন্যাপ ভাসানী বা ন্যাপ মুজাফফর ইত্যাদি দলগুলির কোন রাজনৈতিক তৎপরতা বলতে গেলে অস্তিত্বের তৎপরতাই ছিল না।

শুধু হক-তোহা, মতিন-আলাউদ্দিন-বদরুদ্দিন উমরদের মাওবাদী চরম বামপন্থী হটকারী দলগুলি যা ভারতের নক্সালবাড়ী আন্দোলনের হোতা চারু মজুমদারের খতমের লাইন অনুসরন করে জোতদার মহাজনদের শ্রেনীশত্রু খতমের উছিলায় উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেনীর বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী আওয়ামীলীগ কর্মী ও সমর্থকদের বেছে বেছে হত্যা করতে লাগলো। অবশ্য তাদের মধ্য থেকে একটি ছোট্ট গ্রুপ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিলম্বে হলেও সামিল হয়েছিল। তথাপি অনেক দেশপ্রেমী যোদ্ধা ও ভ্রান্ত তাত্বিক বিশেষণে বিভ্রান্ত হয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন এবং ভুল পথে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সরাসরি সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছেন।

একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গে তো বাংলাদেশী শরনার্থী দেখলেই নক্সালপন্থীরা আক্রমনে উদ্যত হতো। আজো এক শ্রেণীর বিচ্যুত বামপন্থীদের মধ্যে সে ধারণা বিদ্যমান আছে। রাশেদ খান মেননরা তো পারিবারিক ভাবেই আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধু বিরোধীতায় অগ্রগামী। ইদানিং হায়দার আকবর খান রনো, নির্মল সেন, ও বদরুদ্দীন উমরদের মত বিচ্যুত বামেরা ও আওয়ামী লীগ বিরোধীতায় সত্য বিকৃতিতে জামাত বিএনপিকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিদিন সকালে সংবাদপত্রে তাজউদ্দিন আহামদ স্বাক্ষরিত বঙ্গাবন্ধুর ঘোষণা প্রকাশিত হতো। এবং সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা মোতাবেক দখলীকৃত বাংলাদেশের অফিস আদালত ব্যাংক বীমা, প্রশাসনের যাবতীয় কাজ কর্ম চলতো।

ন্যাপ ভাসানি ও ন্যাপ মোজাফফর মনিসিংয়ের কমিউনিষ্ট পাটি আওয়ামী লীগের ঘোষণা অনুযায়ী সকল কর্মসুচী বাস্তবায়িত করতো। এমনকি নুরুল আমিন ও বঙ্গাবন্ধুর ৭ই মার্চের ঘোষণার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ তখন পুর্ব পাকিস্তান নামক পাকিস্তানের তথাকথিত

প্রদেশটি ''বাংলাদেশ'' নামে আওয়ালী লীগের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ মোতাবেক পরিচালিত হতো।

২৫শে মার্চের শেষ রাতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মিমাংসিত সর্বজন স্বীকৃত বিষয়টি নিয়ে আজ যারা ইতিহাস বিকৃতির ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করছে তাদের অবগতির জন্য জানাই যে কোন এক অখ্যাত মেজর বাঁশীতে ফু দিবে আর সাড়ে সাত কোটি মানুষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে!! এ ধরণের এটেনশন ভঙ্গিতে কেউ খাড়া ছিল না। এ পাগলের প্রলাপ বা বালকমস্তিস্কপ্রসুত বালখিল্য তত্ব শুধু আস্তাকুড়েই শোভা পায় মনুষ্য সমাজে নহে।

এমাজ উদ্দিন, মনিরুজ্জমান মিয়ারা দুপায়ী মনুষ্যাকৃতির হলেও আদপে জ্ঞানপাপী। যাঁদের উপর ভর করছে গোয়েবলসের প্রেতাত্মা এমাজ উদ্দিন মনিরুজ্জমানের মত জ্ঞানপাপীরা যা পারেন প্রচেতা বদরুদ্দিন উমরের মত পন্ডিতের পক্ষে কি কথার চাতুরালীতে দিনকে রাত করার ব্যর্থ গোয়েবলসীয় নীতি গ্রহন করা উচিত? তাঁর কি অর্থের টানাটানি এমন পর্যায়েই পোঁছে গেছে যে জোট সরকারের উচ্ছিষ্ট ভোগের জন্য পা চাটতে হবে ? ভাবতে ও অবাক লাগে।

পরিশেষে একটি বিষয় পরিস্কার হওয়ার প্রয়োজন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে। ন্যাপ ভাসানি, ন্যাপ মুজাফফর ও মনি সিংহের কমিউনিষ্ট পাটি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে ছিল। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার যা ''মুজিব নগর সরকার'' নামে পরিচিত। সে সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ।

এ সরকারই ছিল বাংলাদেশের প্রথম বৈধ ও বিশ্ব স্বীকৃত সরকার । মুক্তিযুদ্ধ এ সরকারের পরিচালনায় সংঘঠিত হয়েছে। সৈয়দ নজরুর ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর (মুক্তি বাহিনী) প্রধান ছিলেন। জেনারেল ওসমানী ছিলেন সেনা বাহিনী প্রধান এবং ১১ জন সেক্টর কমান্ডারের ১ জন ছিলেন জিয়াউর রহমান। যিনি মেজর ''রিট্রিট'' নামে পরিচিত ছিলেন। কেননা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসভিত্তিক কোন পুস্তকেই উলেখ নাই যে মেজর জিয়া কোন রণক্ষেত্রে সন্মুখ যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছেন। তিনি পশ্চাৎপসারণে বিশেষ সিদ্ধসৈনিক ছিলেন।

আরো একটি কথা স্পষ্ট হওয়া দরকার। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। নবাবগঞ্জ থানাধীন ''অপারেশন ইছামতি'' নামে দেশ বিদেশে খ্যাত পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর যুদ্ধ জাহাজটি অসমসাহসিকতায় মুক্তিবাহিনী ডুবিয়ে দিয়েছিল। সেই অপারেশনে সাঁতরিয়ে তীরে উঠা পরাজিত পাকিস্তানী সৈনিকদের গ্রামের মহিলারা বটি দিয়ে কুঁপিয়ে কুঁপিয়ে হত্যা করেছিল। কি প্রচন্ড ঘৃনা, ক্ষোভ ও প্রতিহিংসা থাকলে গ্রামের সহজ সরল জননীরা রণরঙ্গিনী মূর্তিতে প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন। ''অপারেশন ইছামতি'' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মুষ্টিমেয় মুসলিম লীগ জামাত বা নেজামে ইসলামের পাকিস্তানপন্থী স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার আলবদর আল শামস ছাড়া সব বাঙ্গালিই মুক্তিযোদ্ধা। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের নয় রাজাকার আলবদরদের লিষ্ট বানানো আশু জরুরী হয়ে পড়েছে বর্তমান রাজনৈতিক সংকট উত্তরণের প্রেক্ষাপটে। যতদিন পর্যন্ত না এই সব চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ একটি '' ব্যর্থ রাষ্ট্রের'' তক্মা এঁটে অধঃপতনের দিকেই ধাবিত হবে। এর কোন অন্যাথা নেই।

লেখক পরিচিতিঃ জেদ্দা প্রবাসী কবি হাবিবুর রহমান মরুপলাশ, রূপসী চাঁদপুর এবং মোহনা র একজন নিয়মিত লেখক। তিনি জেদ্দা লেখক গোষ্ঠীর সভাপতি। জেদ্দার প্রধান সাহিত্য সাময়িকী বহুমাত্রিক এর সম্পাদক। এ ছাড়া রণাঙ্গান'৭১, জনক ও অনির্বান এর প্রধান সম্পাদক। তিনি একাধারে কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক। মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স প্রকাশ করেছে এ গুণী লেখকের একখানি গল্পগ্রন্থ 'সর্বনাশের সকাল বেলা'।
প্রকাশকালঃ ১৯৯৯ সালের অমর একুশে বইমেলা।

স্বাধীনতা - Freedom

রফিকুল ইসলাম

মুক্তি,স্বাধীনতা, ফ্রিডম শব্দগুলি পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মানুষের মতোই বাংলাদেশের প্রায় সকল মানুষেরই প্রিয় শব্দ। প্রতিটি মানুষকেই এ শব্দগুলি ভীষণভাবে আকর্ষণ করে। প্রতিটি মানুষ যেন এগুলোকে চরমভাবে উপভোগ করতে পারে এটাই দেশের স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য। আর এজন্যই লক্ষ কোটি মানুষ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে, প্রাণ দিচ্ছে। ব্রিটিশ বা পাকিস্তান শাসন আমলেও মানুষ ভাত মাছ খেয়েছে, শুধু ভাত ও মাছ খেয়ে বেঁচে থাকার জন্যই একজন মানুষ পৃথিবীতে জন্মায় না।

বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। এ স্বাধীন দেশে মানুষ তার সরকারের দ্বারা পরিচালিত মন্ত্রণালয়, অফিস-আদালতকে তাদের নিজের বলে ভাবতে পারছে কি না; সেখানে গেলে মর্যাদা, সম্মান, সততা, বৈষম্যহীনতা, স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা অনুভব করতে পারছে কি না তাও অন্যতম মূল বিবেচ্য। বিবেচ্য- দৈনন্দিত কাজের প্রয়োজনে স্বাধীন জাতির সংশ্লিষ্ট একটি সরকারি অফিসে এসে সম্ভাব্য সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে, সম্ভাব্য সবচেয়ে বেশী গুরুত্বের সাথে, অতি উঁচু দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সেবা নিয়ে একজন সাধারণ নাগরিক অফিস থেকে বের হয়ে আসতে পারেন কি না? স্বাধীন দেশের একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবে একজন বাংলাদেশী যখন তার দেশের একটি সরকারি অফিসে কোনো কাজে গিয়ে, কাজটি সেরে সেখান থেকে বের হয়ে আসেন তখন কি তিনি উপলব্দি করতে পারেন যে তিনি যথার্থই একজন মুক্ত মানুষ; তার মুক্ত ও স্বচ্ছ চিন্তা আর কাজের ক্ষমতাকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাবার জন্য এটা পৃথিবীর সর্ব শ্রেষ্ঠ অফিস; তাকে সহায়তা করার জন্য দেশের সমস্ত ক্ষমতা ও সৌন্দর্যকে তিনি তার পাশে পেয়েছেন - ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিয়ম এবং আইন মেনে চলেছেন?

একজন মানুষ পৃথিবীর অন্য কোথাও না পারলেও তার বাড়িতে পারে, ইচ্ছামতো সর্বকিছুই করতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার এ 'ইচ্ছা' এবং 'করা' অন্য কারো স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন না করে বা পরিবার এবং দেশের নিয়ম ও আইন লঙ্ঘন না করে। বাংলাদেশটিও ১৩কোটি বাংলাদেশীর বাড়ি; দেশের প্রতিটি মানুষ তার বাড়িতে তার দেশে, তার ইচ্ছা, আনন্দ, উলাস, বিশ্বাস লালন ও পালনের মাধ্যমে তার স্বাধীনতা চূড়ান্ত বিন্দু পর্যন্ত উপভোগ করতে পারছে কি? যদি তা পারা সম্ভব হয় তখনই সম্ভব সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের, অনেক মানুষের মতো বাংলাদেশের মানুষকেও যে অসম্ভব ক্ষমতা দিয়ে পৃথিবীর সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব-মানুষ হিসেবে বানিয়ে পাঠিয়েছে তার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা।

বাংলাদেশের ১৩ কোটি মানুষ, দেশের বোঝা নয়, তারা দেশের সম্পদ, অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ, এক একজন এক একটি চলমান কম্পিউটার, অসম্ভব ক্ষমতাবান - সুপার কম্পিউটার। দেশের নেতৃবৃন্ধ এবং সরকারের কাছে তাদের অতি সামান্যই প্রয়োজন এবং চাওয়া; আর তা হল মুক্তি; সকল প্রকার বাঁধা থেকে মুক্তি; ইচ্ছা, আনন্দ, উলাস, বিশ্বাস, ক্ষমতা, মর্যাদা সম্মান, ভালোলাগা, ভালবাসা, নিজের দেশের অফিস-আদালতকে নিজের মর্যাদা সহায়তা আত্মবিকাশের শ্রেষ্ঠস্থান হিসেবে পাওয়া, অনুভব করা এবং

যে কোনো চিন্তাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার পূর্ণ ও কার্যকরী স্বাধীনতা; আর এ স্বাধীনতার পথে যদি কোথাও, কখনও, কোনো বাঁধা পরিলক্ষিত হয়, তা থেকে মুক্তি।

Guarantee of Rights and Freedoms is directly related to স্বাধীনতা A স্বাধীন person has to consider whether she/has the right to life, liberty and security of her/himself and the right not to be deprived thereof exeept in accordance with the principles of fundamental justice. Is equal protection and equal benefit of the law and all state sponsored activities without discrimination?

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ স্বাধীনতাকে গভীরভাবে ভালবাসেন। এ স্বাধীনতা তার মৌলিক অধিকার। স্বাধীনতাই তাকে সে অধিকার দিয়েছে। এ মৌলিক অধিকার নিশ্চত করতে অর্থ নয়, দৃষ্টিভঙ্গিই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। একটি মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মচারী বা কর্মকর্তাও অন্যত্র একজন সাধারণ নাগরিক। তিনি সেখানে কত সুনির্দিষ্ট, স্বচ্ছ, উৎকৃষ্ট সেবা পেলে নিজেকে সার্থক মনে করতে পারেন ঠিক ততটুকু সেবাই জাতি, তিনি যখন তার কর্মক্ষেত্রে কর্মরত তখন তার কাছ থেকে পেতে চায়, পেতে পারে। আর তা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে এ স্বাধীন জাতি খুব সহসাই হয়তো সবার স্বাধীনতা এবং সব মুক্তিকে নিশ্চিত করে পৃথিবীতে একটি মহান জাতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নেবে।

লেখক পরিচিতিঃ

রফিকুল ইসলাম।
ভ্যাঙ্কুভার, কানাডা।
*তিনি 'মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অব দ্যা ওয়ার্ল্ড' নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট। তাঁর এবং তার প্রতিষ্ঠান **মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অব দ্যা ওয়ার্ল্ড** এর প্রচেষ্টায় অমর একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পুরো বিশ্বে আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ আমাদের এক পরম পাওয়া। এ আমাদের জাতির জন্যে, ভাষার জন্যে এক বিশাল অহংকার। এই মহান কাজের জন্যেই তিনি আমাদের কাছে এক জীবন্ত কিংবদন্তী হয়ে থাকবেন।*

বাংলাদেশ এখনো কাঁদে

কুদ্দুস খান

মুক্তিযুদ্ধের পর অনেকদিন কেটে গেল। আজ মনে পড়ে সেই সময়ের জনপ্রিয় গান- 'বার বার ঘুঘু এসে খেয়ে যেতে দেবো নাকো আর ধান'। বাংলা মুক্ত স্বাধীন দেশের স্কুলে আমি অটো প্রমোশান পেলাম। পরের বছর স্কুলে এলো ঝক ঝকে নতুন বই। তাও বিনা মুল্যে। বঙ্গাবন্ধু তখন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী। পত্র পত্রিকায় এর বই পুস্তকে তার নামের আগে জাতির পিতা কথাটা জুড়ে দেয়া হয়েছে। যে কোন জাতির একজন কর্ণধার বা পিতা থাকে। যেমন ভারতে মহাত্মা গান্ধী, তুরুস্কে কামাল আতাতুর্ক, গণ চীনে মাও সে তুং। তেমনি আমাদের শেখ মুজিব।

স্বাধীন বাংলাদেশের একুশে ফেব্রুয়ারীতে বঙ্গাবন্ধু বললেন, দেশের ভাষা বাংলা, সরকারী বেসরকারী এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলাই হবে প্রথম ও প্রধান ভাষা। যদি ভাষাবিদরা শব্দ পরিভাষা তৈরীতে ভুল করে তবে ভুলটাই এখন চালু হবে- পরে তা শুদ্ধ করা হবে। শুরু হল সর্বত্র বাংলা ভাষার প্রচলন।
সম্ভবত আবেগে এবং ভালোবাসার কারণে বঙ্গাবন্ধু বাংলাদেশ এবং বাঙ্গালী জাতিকে ভিন্ন করে দেখেননি। যারা মনে করেন বঙ্গাবন্ধু ভারত ঘেঁষা ছিলেন- তারা যদি বঙ্গাবন্ধুর বাংলা প্রীতি এবং জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধের কথা একটু তলিয়ে দেখেন তবে হয়তো তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবেন।

পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডন থেকে যখন তিনি বাংলাদেশে এলেন, দেশবাসী তাঁকে অসীম শ্রদ্ধাবোধে বরণ করলেন। দেশ, জাতি এবং জাতির বিজয়ী নেতা সবই তখন একই সূত্রে গাথা ছিল। কিন্তু তারপর যতই দিন যেতে থাকল ততই শুরু হল বিভেদ। এই বিভেদ আংশিক ষড়যন্ত্রের, আংশিক দুঃশাসনের আর বাকিটা হয় মুল্যায়নের।

যেমন সামরিক বাহিনী ছিল বেঙ্গাল রেজিমেন্ট, তার বাইরে বঙ্গাবন্ধু সরকার 'রক্ষী বাহিনী' তৈরী করে প্রথম বিভেদ আনলেন সেনানিবাসে। ছাত্রলীগের এক গ্রুপ হলেন বঙ্গাবন্ধুর প্রিয়- অন্য গ্রুপ
হলেন রাষ্ট্র বিরোধী। রাতের অন্ধকারে মাত্র তিন মাস সময়ের মধ্যে তথাকথিত 'দাদা' গঠন করলেন জাসদ নামের ছাত্রকেন্দ্রিক একটি জাতীয় দল। যারা বৈজ্ঞানিক ফর্মুলায় সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রের মুল কাঠামো করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। জাসদ শায়েস্তা করতে গিয়ে হিমশিম খেলো রক্ষী বাহিনী। সেই সংগে যুক্ত হল সিরাজ শিকদারের বাহিনী আর লুকিয়ে থাকা রাজাকার আল-বদরেরা এই সময় যে কোন সরকার বিরোধী কাজে ছিল নিবেদিত প্রাণ।

বাইশ পরিবারের বিরুদ্ধে বঙ্গাবন্ধুর ভাষণ ছিল ৬৯, ৭০ এ প্রধান বিষয়। ৭০ এর নির্বাচনের মুল দফা ছিল অর্থনৈতিক সমতা ও স্বায়ত্ব শাসনের অঙ্গীকার। জনগন স্বতস্ফুর্তভাবে বঙ্গাবন্ধুর দলকে বিজয়ী করল। বৈষম্য এবং পরিশুকানের একরোখা নীতির বিরুদ্ধে সেই নির্বাচন ছিল সম্মিলিত জবাব। তারপর যখন সরকার গঠনের সময় এল তখন বঙ্গাবন্ধু তাঁর দলের অবস্থান ছিল বেশ নাজুক। যদিও তিনি সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা তথাপি ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো ছিলেন একই নীতিতে অটল। যার মুল হচ্ছে অখন্ড পাকিস্তান এবং

তার নেতৃত্বে থাকবে পশ্চিম পাকিস্তান। যে কোন মুল্যেই এই নীতিকে বাস্তবায়নের একরোখা পদ্ধতিকে বাস্তবায়নের জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন সমস্ত পশ্চিমারা। তাদের সাথে আপোস মিমাংশা হল না- তখন বাধ্য হয়েই বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে ঘোষণা দিলেন 'আর যদি একটা গুলি চলে........আমাদের খাজনার পয়সা দিয়ে কেনা গুলি আমাদের বুকের ওপর চালানো হয়.........যার যা কিছু তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।

শত্রুমুক্ত বাংলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন দেখলেন তাঁর চারপাশে শত্রু। যাকেই বিশ্বাস করেন সেই তাঁর বিশ্বাসে আঘাত হানে- তখনই হয়তো তিনি অসহায় হয়ে ঘোষণা করলেন বাকশাল।

বাকশাল গঠনের পরপরই বঙ্গবন্ধু মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন- এ যেন তার আত্মহত্যা। কাকে তিনি হত্যা করবেন? মুজিব তো হত্যাকারী ছিলেন না। হত্যার বিরুদ্ধে, বুলেটের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে তিনি যখন উপকূলে এসে দেখলেন তিনি এখন সর্বাধিনায়ক। কিন্তু তার সর্বাধিনায়কত্ব সবাই যেন সহজভাবে মেনে নিতে পারলেন না। ভাগ হয়ে গেল তার প্রশাসন। পাকিস্তানী বুরুক্রেটরা দিলেন এক ধরণের ফর্মুলা। আর বিজয়ী ছাত্র যোদ্ধারা দিলেন ভিন্ন ফর্মুলা। শেখ মুজিব উভয়কে খুশি করতে গিয়ে দুঃখী বানালেন তার প্রিয় জনগণকে। জনগণ তাকে যে সমর্থন দিলেন সে সমর্থন যেন মুহূর্তেই গুঁড়িয়ে গেল। সামরিক বাহিনীর কয়েকজন বিপবী তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে নির্মমভাবে হত্যা করলো। যা ইতিহাসে বিরল।

শেখ মুজিব নেই। বঙ্গবন্ধু নেই। জাতির পিতা নেই। কিন্তু বাংলাদেশ আছে। যতই বিভক্ত করা হোক না কেন বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশ থেকে বিভক্ত করা যাবে না। যেমন বিভক্ত করা যায় না পানিকে বাতাসকে। যতই দিন যাবে দুঃখে সুখে বাঙ্গালী জাতি, বাংলাদেশী বাঙ্গালীরা এক বাক্যে বলবেন তাদের নেতা শেখ মুজিব। কেননা আমাদের ইতিহাসে শেখ মুজিবের মত আর কোন বাঙ্গালীর জন্ম হয়নি। ইতিহাসের এই অগ্নি পুরুষের জীবনে অনেক ব্যর্থতার ক্ষত থাকলেও তার সমকক্ষ আর কেউ নেই। তার জন্য বাংলাদেশ আজ কাঁদছে, আগামীতেও কাঁদবে। কেননা তিনি যেভাবে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের ভালবাসতেন সেভাবে আর কেউ ভালবাসতে পারেনি।

আগস্ট ২০০৪ইং শ্রাবণ ১৪১১বাঙলা
লেখক একজন সম্পাদক, 'ভিন্নমত' বাংলা ওয়েব সাইট।
পরিবার পরিজন নিয়ে লসএঞ্জেলেস (যুক্তরাষ্ট্রে) স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

স্বাধীনতাঃ চালচিত্র বাংলাদেশ

তাহের ম. শায়েখ

কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী
গণ-সূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর
অমর কবিতা খানি
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
..............................স্বাধীনতার সংগ্রাম

শোষণ শাসনে নির্যাতনে অতিষ্ঠ বাঙালি জাতির হৃদয় অলিন্দে গোপন আরাধনা-উপাসনা-বাসনা, নিমগ্ন প্রার্থনা বন্দনায় সদয় মহান রাব্বুল আলামিনের অশেষ কৃপার মানব-রূপ; শত বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ঘোষিত হয় আমাদের মুক্তির মন্ত্র।

উদ্যত হায়েনার নির্মম গ্রাসকে প্রতিহত করতে পাজরের অভেদ্য দেয়াল গড়ে তুলে দুর্বিনীত মন্ত্রমুগ্ধ প্রত্যয়ী বাঙালি। লড়াকু বাঙালির কাছে আত্মসমর্পন করে পশুশক্তি। মৃত্যু উপত্যকায় স্বজন হারানোর বেদনা-জীবনে গ্রন্থিত হয় আমাদের গৌরবের নকশীকাঁথা; আমাদের স্বাধীনতা।

'৭১ এর পরাজয়ের লজ্জা যন্ত্রণা-ষড়যন্ত্রের বিস্তার করে ঘরে-বাহিরে। স্বাধীনতার-প্রত্যুষে হন্তাক কেড়ে নেয় নকশীকাঁথার উজ্জলতম নক্ষত্র-জাতির পিতা সহ তাঁর পরিবার।অতপর অভিসংবাদিত সন্তানের ব্যক্তিক-সামাজিক রাষ্ট্রিক জীবনে জ্বলনের মাতম এবং অ-প্রতিহত প্রবাহন। যেন নিশ্চিহ্ন করবেই বাঙালি প্রজাতি।

ঘরে বাহিরে শত্রুর অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং আমাদের অসহনশীল মতাদর্শ, অ-দরদী রাজনৈতিক নেতা, অ-প্রখর বুদ্ধিমত্তা, অ-সৎ আমলা, অ-পরিকল্পিত সম্পদের ব্যবহার, অপচয়-জনশক্তির লোভী ব্যবসায়ী, অসহিষ্ণু আমরা- আজ এতই বিপন্ন। ঐক্যহীনতায়, নিরক্ষরতায়, দেশ-প্রেমহীনতায়, অবসাদে বিষাদে সন্ত্রাসে, হানাহানি, অবিশ্বাসে।

আজকের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির তুলনামুলক চিত্র বেদনা বিধুর! এই বিপন্নতা হতে, পতন হতে, কে রোধ করবে আমাদের কোন সাহস; কে আবার ডাকবে '৭১এর মতো পাজরের দেয়াল তুলে দিতে, অঘোষিত শত্রুর সম্মুখে। বড় প্রয়োজন আরেকটা জনযুদ্ধের। অশুভর ধ্বংস অনিবার্য। কারণ আমরা বাঙালি গৌরবের মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই।

লেখক পরিচিতিঃ
সম্পাদক বাংলা ওয়েবম্যাগাজিন অভিক ডট নেট।
জেদ্দা প্রবাসী কবি তাহের ম. শায়েখ
এই প্রেমিক কবির প্রকাশিত গ্রন্থঃ নিষিদ্ধ উচ্চারণ (কাব্যগ্রন্থ) ১৯৯১
সম্পাদনাঃ 'নবোদয়' নবোদয় সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের মুখপত্র
প্রকাশিতব্যঃ দ্বৈরথে বিনাশ সময় (যন্ত্রস্থ)

৭১ এর খোয়াই

আ. স. ম জিয়াউদ্দিন

তখন কত বয়স হবে আমার? মাত্র তৃতীয় শ্রেনীতে উঠেছি জানুয়ারীতে। আব্বার চাকুরীর সুবাদে আমরা থাকতাম তৎকালীন সিলেট জেলা (বর্তমানে হবিগঞ্জ জেলার) শায়েস্তাগঞ্জে। দুইটা বিশেষ কারনে ১৯৭১ সালের সকল উত্তাপ আর উত্তেজনা আমাদের কাছে খুবই বাস্তব ছিল। প্রথমতঃ আমাদের বাসা ছিল শায়েস্তাগঞ্জ প্রধান সড়কের এক চার রাস্তার মোড়ে। এক পাশে ডাক বাংলার মাঠ যেখানে সাধারণত প্রতিদিন সভা - সমাবেশ লেগে থাকতো, অন্যদিকে হবিগঞ্জগামী সড়ক যেখান দিয়ে হবিগঞ্জের বৃন্দাবন কলেজের ছাত্ররা মিছিল নিয়ে যাতায়ত করতো। বিশেষ করে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ছাত্রদের মিছিলগুলো ছিল আমাদের প্রধান আকর্ষণ। বাসার সীমানা দেওয়ালের উচ্চতা কম থাকায় জানালার পাশে দাঁড়িয়ে মিছিলগুলো সহজেই দেখা যেত।

আমাদের তখন ৯ ভাইবোন। বড় দু'জন মুন্সীগঞ্জে নানার বাড়ীতে থাকে আর বাকী সাত জনের বিশাল মেলায় এক উৎসব মুখর পরিবেশ লেগে থাকতো আমাদের বাসায়। দ্বিতীয়তঃ যে কারণটা আমাদের জন্যে ছিল উত্তেজনার তা হলো বাসার সান্ধ্যকালীন আড্ডা। আব্বা শ্রমিক রাজনীতির সাথে জড়িত থাকার সুবাদে সন্ধ্যায় বাসায় আসতেন হবিগঞ্জের সাঈদুর উকিল, শায়েস্তাগঞ্জের পুরাণ বাজারের ডাঃ জিতু মিয়াসহ আরও অনেকে। এর সাথে যোগ দিত স্থানীয় ছাত্র নেতারা। পরিস্থিতির অবনতির কারণে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাড়ীতে ফিরে গিয়ে ছিল - তাদের একদল আসতো সে আড্ডায়। আড্ডা চলতো গভীর রাত অবধি। আলোচনা হতো দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে - আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। কথার মধ্যে বেশী শুনা যেত শেখ মুজিব আর মাওলানা ভাসানীর নাম।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের একটা ক্যাম্প ছিল আমাদের বাসার ঠিক উল্টা দিকে। সেটা ছিল পিডিপির প্রার্থীর ক্যাম্প। খুব কমই লোকজন সেখানে থাকতো। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের ক্যাম্পের সামনে প্রচন্ড ভীড়, সেটা ছিল একটু দুরে। আমার মেজভাই, যে কিনা ভাইদের মধ্যে তখন বড় ছিল - সে আব্বা-মাকে লুকিয়ে পিডিপির ক্যাম্পে চলে যেত মিস্টি আর জিলাপী আনার জন্যে। এক সময় নির্বাচন শেষ হলো। আওয়ামী লীগ জিতে গেল। সেই রাতেই পিডিপির ক্যাম্প ভেঙে মানুষরা সবকিছু নিয়ে গেল।

সেই সময়ের একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে। চা বাগানের কুলিরা আসতো আব্বার অফিসে। এমন একজন একদিন জিজ্ঞাসা করলে - সাহাব ভোট দিলাতো শ্যাক সাবরে, মানিক মিয়া জিতে কি কোরে? কি সহজ সরল প্রশ্ন। কিন্তু এর মধ্যে লুকিয়ে ছিল শেখ মুজিবের প্রতি মানুষের আস্থা আর বিশ্বাস।

সময়ের সাথে পরিস্থিতি যত খারাপ হতে লাগলো - রাত্রে মশাল মিছিলের সংখ্যা আর আয়তন বেড়ে যেতে লাগলো। প্রতি রাত্রেই মিছিল হতো - মিছিল থেকে শোগান হতো - ''জয় বাংলা", "জয় বঙ্গাবন্ধু", ''তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা" "আপস না সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম"। আমার মনটা বিশেষভাবে খারাপ থাকতো কারণ তৃতীয় শ্রেণীতে উঠার পর নতুন বই পাইনি - স্কুলের তো প্রশ্নই উঠে না। এদিন শুনা গেল স্কুলের হেডস্যার নিবাস বাবু ভারত চলে গেছেন। এভাবে দিনভর মিছিল-

সভা আর রাতে মশাল মিছিল দেখে আর মেজ ভাইএর আমদানী করা নানান গুজব শুনে আমাদের দিন কাটতে লাগলো।

একদিন ভোরে আব্বার পিয়ন ছিয়া সিং এর প্রচন্ড ভয়ার্ত কণ্ঠে ডাকাডাকিতে আমাদের ঘুম ভাঙলো। সেটা সম্ভবতঃ ২৬শে মার্চ। সে চিৎকার করে বলছে –"সাহেব, আপনি বলেছিলেন কিছু হবে না – ডাকায় লাখ লাখ মানুষ মরে গেল।" আমরা সবাই ঘুম থেকে উঠে বসে আছি । কিছুই বুঝতে পারছি না। অন্যদিকে সিয়া সিং এর কথাও তেমন বিশ্বাস করা যাচ্ছে না কারণ প্রায় রাত্রেই সে মদ্যপান করে চিৎকার করে কাঁদে – আবোল তাবোল বকে। বিহারের অধিবাসী সিং ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে একা একা থাকে। তাই মদ্যপানের পর তার পরিবারের কথা মন হয় আর কাঁদে। কিন্তু সেটা তো রাতের বেলা। এই অবস্থায় পাশের বাসা থেকে একজন একটা রেডিও নিয়ে এলো। সবাই বসে রেডিও শুনলো আর আলোচনা চলতে থাকলে কি হবে আর কি করা যাবে। একটা সময়ে সবাই নিশ্চিত যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে ।

কলোনীর মাঠে শুরু হয়ে গেল যুবকদের ড্রিল আর লাঠি চালানো শিক্ষা। মনে পড়ে কয়েকটা নাম যারা বিশেষ ভাবে উৎসাহিত ছিল যুদ্ধের জন্যে – মকবুল, ঈদ্রিস, গফুর, সুকুমারসহ আরো অনেকে। অন্যদিকে চললো তীর ধনুক বানানো আর মেয়েরা মরিচ গুড়া করে প্যাকেট করছে। একটা নিরস্ত্র জাতির পশুদের বিরুদ্ধের লড়াইয়েব এক বিচিত্র প্রস্তুতি চলতে লাগলো।

আব্বা মা সারাদিন বিমর্ষ হয়ে কথা বলতো। আমাদের গ্রামের বাড়ী মুন্সিগঞ্জের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। সেখানে চলে যাওয়ার চিন্তা করা যাচ্ছে না। মেঝ ভাই, যার বয়স ছিল সে সময় ১৩/১৪ বৎসর, সে একদিন এসে আব্বাকে বললো সে ভারতে চলে যাচ্ছে একটা দলের সাথে সাথে। মা কান্নাকাটি শুরু করলো। এরই মধ্যে একদিন আমাদের প্রাইভেট টিউটর লস্করপুরের আদ্য পাশা স্কুলের শিক্ষক শহীদ স্যার এসে আব্বার সাথে কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন। তারপর দিন আমরা সবাই চলে গেলাম লস্করপুরের বালুচর নামের গ্রামে। যাওয়া মাত্রই গ্রামটা আমাদের সব ভাইবোনের পছন্দ হয়ে গেল। এর কারণ হচ্ছে গ্রামের পাশ দিয়ে বহমান খরস্রোতা খোয়াই নদী। বর্ষা ছাড়া অন্য সময় যাতে হাটু পানি থাকে। চমৎকার প্রবাহ আর কলকল শব্দ। আমরা প্রথম কয়েকদিন বেশিরভাগ সময় নদীর কাছে বা নদীতেই থাকতাম। তবে আব্বা বন্ধের দিনগুলো ছাড়া অন্যদিনগুলো শায়েস্তাগঞ্জের বাসায়ই থাকতো। বাসার মালামাল চুরি হওয়া ছাড়াও নিয়মিত অফিস করা ছিল উনার কাজ।

সম্ভবতঃ এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে শায়েস্তাগঞ্জে পাকিস্তানী বাহিনী প্রবেশ করে। তখন কয়েকদিন আব্বা আমাদের সাথে থাকলেন। পরে একদিন গিয়ে দেখেন বাসার সব মালামাল লোপাট হয়ে গিয়েছে। শুনা যাচ্ছিল বিহারীরা সব কিছু লুট করে নিয়ে গিয়েছে। সুতরাং বাসায় থাকার আর কোন কারণ নেই। আব্বার মনের মধ্যে একটা ভীষণ চাপ নিয়ে কয়েকদিন আমাদের সাথে গ্রামে থাকলো। চাপটা ছিল তার অফিসে বেশ কিছু টাকা জমে ছিল এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে সে টাকা ঢাকায় পাঠানো যায়নি। শহীদ স্যার আর অন্যান্যদের সাথে আলোচনার পর আব্বা শায়েস্তাগঞ্জে গেলেন খুবই ভোরে, যাতে হেটে যেতে সুবিধা হয় আর দিনে দিনে ফিরে আসা যায়।

আমরা আশা করতে লাগলাম আব্বা আসবে দুপুরে। রাত্রে বসে থাকলাম এক সাথে সবাই খাবো বলে– কারণ এক সাথে সবাই বসে খাওয়া ছিল আব্বার পছন্দের একটা কাজ। কিন্তু রাত্রেও যখন আসলেন না, আমরা চিন্তায় পড়ে গেলাম। সবাই বললো হয়তো সকালে আসবে। এভাবে একদিন – দুইদিন – সাতদিন হয়ে গেল। তখন দেখলাম সে বাড়ির মানুষজনের ব্যবহার যেন কেমন বদলে যাচ্ছে। লক্ষ্য করে

দেখলাম পুরুষ মানুষরা নতুন দাঁড়ি রাখার কারণে কেমন রুক্ষ ভাব ধারণ করেছে। এ পর্যায়ে দেখলাম সে বাড়ীর বাচ্চারা আমাদের সাথে খেলতে আসছে না।

একদিন একজনকে ধরে জিজ্ঞাসা করতে সে বললো –''তোমরা আওয়ামীলীগ। তোমাদের আব্বাকে মিলিটারী মেরেছে এবং তোমাদেরও মারবে।" মনে আছে আমরা ভাইবোনরা সারাদিন কেঁদেছি আব্বাকে মেরে ফেলেছে শুনে।

সে গ্রামের একজন অধিবাসী এক রাত্রে এসে আমাদের চুপি চুপি কিছু কথা বলে গেল। যার মর্মার্থ হচ্ছে – সে নিশ্চিত যে আমাদের আব্বা আর নেই। শুনা গেছে তাকে শ্রীমঙলের দিকে নিয়ে গিয়েছে। শ্রীমঙ্গাল হচ্ছে আর্মির বড় ক্যাম্প এবং ওখানেই ওরা বেশী মানুষ মারছে এবং নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। এখন একটা কাজই কেবল আমরা করতে পারি। তা হচ্ছে, কাল থেকে নদীর পাড়ে বসে লাশের হসিদ করা। যদি পাই, তাকে ডাকতে হবে এবং সে লাশ নদী থেকে উঠাবো কারণ আব্বা ভাল মানুষ ছিলেন সুতরাং তার জানাজা আর দাফন হওয়া দরকার।

এটা শুনার পর আমাদের রাত্রের ঘুম শেষ। কখন সকাল হবে – কখন যাবো নদীর পাড়ে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি ঘুমিয়ে পড়ে ছিলাম। সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগে দেখি রৌদ্র। তাকিয়ে দেখি ভাইবোনরা কেহ আশপাশে নেই। এ দৌড়ে নদীর পাড়ে চলে গেলাম। খোয়াই নদী যারা দেখেননি তাদের জন্যে বলা – এটা আর দশটা নদীর মতো নয়। এর পাড় হচ্ছে অনেক উচু – মোটামুটি একটা টিলার মতো। ভিতরদিকে একটু সমতল জমির মতো, এরপর নদী। এক দৌড়ে উপরে উঠে ভাইবোনকে খোঁজার আগেই চোখ চলে গেল নদীর দিকে। দেখি বেশ কয়েকটা লাশ ভেসে যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে নদীর সৌন্দর্য ম্লান হয়ে গেল আমার কাছে।

সবচেয়ে কাছ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে যে লাশটা তার উপর বসে আছে দু'টা কাক। এগিয়ে গেলাম ভাল করে দেখার জন্যে। দেখলাম লাশের গায়ে তেমন কাপড় নেই, উপর হয়ে ভাসছে । হাত দুইটা দড়ি দিয়ে পিছনে করে বাঁধা। শরীরের মাংস খুলে পড়ে গেছে অনেকটুকু, বিভৎষ দৃশ্য। মোটামুটি নিশ্চিত এটা আব্বার লাশ না। পিছন ফিরে দেখি আমার অন্য ভাইবোনরা আমার পিছনে কখন যে এসে দাঁড়িয়ে আছে – ক্লান্ত দৃষ্টি আর অনিশ্চয়তার ছাপ মুখে। জানলাম ওরা অনেক্ষণ ধরে আছে। সবাই বসে পড়লাম একটা গাছের নিচে। দুর থেকে ভেসে আসা লাশ দেখে গায়ের কাপড় আর অন্যান্য লক্ষণ দেখে যদি মনে হয় কাছাকাছি তবে এগিয়ে গিয়ে দেখে আসা। এর মধ্যে শহীদ স্যারসহ অনেকে এসে দেখে গেছে আমাদের। অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করেছেন – কেহ পরামর্শ দিয়েছে কিভাবে নিশ্চিত হতে হবে এটা আমাদের প্রার্থীত লাশ কিনা। এভাবে এক পর্যায়ে ক্ষুধার্থ হয়ে গেলে পালা করে খেয়ে আসা আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লাশের পর্যবেক্ষণ।

আমরা কখনও চোখ ফিরাতে পারিনি নদী থেকে কারণ ক্রমাগত লাশ ভেসে আসছে –একটা – দুইটা – তিনটা ..... পঞ্চান্ন – ছাপ্পান্ন –সাতান্ন ... অগুনিত। কখনও একটা, কখনও জোড়া জোড়া, কখনও বা দলবদ্ধ গুচ্ছাকারে। মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলি গুনতি। ক্লান্ত হয়ে যাই গুনতে গুনতে – কিন্তু আমাদের কাজের শেষ হয় না। এ অবস্থায় একদিন একটা লাশের গায়ে দেখা গেল গাঢ় নীল শার্ট। বোনরা চিৎকার করে উঠলো। কারণ আব্বা যেদিন আমাদের ছেড়ে চলে যায় সেদিন তার পরণে ছিল নীল শার্ট আর খাকী প্যান্ট। এগিয়ে এলো কয়েকজন জাল নিয়ে। কাছে এনে দেখা গেল সেটা আমাদের প্রার্থী বস্তু নয়।

বোনেরা কান্নায় ভেঙে পড়ল। উপস্থিত জনতা সান্তনা দিল। তারপর আবার শুরু হলো পর্যবেক্ষণ ...অপেক্ষার পালা...।

এভাবে যে কতদিন চলতো তা বলা কঠিন ছিল। এর মধ্যে একদিন বিকালে ধবধপে সাদা পাঞ্জাবী পড়া টুপি মাথায় কিছু লোক আমাদের দেখে চলে গেল। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে গেলে শুনলাম মার কান্নার আওয়াজ। শুনলাম আমাদের আজ রাতের মধ্যে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে । কারণ শান্তি কমিটির লোকজন চেয়ারম্যান এসে বলে গেছেন –

একটা আওয়ামী লীগ পরিবারকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে আর্মী ক্যাম্প এ বাড়ির দিকে নজর রাখছে। সুতরাং এদের বের করে দিলে আর্মির নজর থেকে বাঁচা যাবে। সুতরাং বাড়ির কর্তা আমাদের আলটিমেটাম দিয়ে দিয়েছেন।

মধ্য রাত্রে শুরু হলো তুমুল বর্ষণ। টিনের চালে বৃষ্টিপাতের ভারী শব্দ আমাদের উদ্বেগকে স্পর্শ করতে পারছিল কিনা মনে নেই। তবে আমাদের অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি চলতে লাগলো। গভীর রাত্রে বাড়ীর লোকজনের থেকে একজন উঠে এসে আমাদের বললো – হবিগঞ্জ শহরের আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে, সেখানে গেলে আশ্রয় পাওয়া যাবে। সেখানেই যাওয়া ঠিক হলো আর বাড়ির কাজের যুবক ছেলেটা আমাদের সাথে যাবে ঠিক হলো। রাত্রির শেষে তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল। ফজরের আজান মৃদু স্বরে যখন শুনা যাচ্ছিল – তখন বাড়ির কর্তা এসে একরকম ঠেলে আমাদের বের করে দিলেন।

শুরু হলো আমাদের চলা। সেই খোয়াই নদী – যা দিয়ে তখনও ভেসে যাচ্ছিল লাশ – তার পিচ্ছিল পাড় ধরে হবিগঞ্জ নামক এক জনপদের দিকে যাত্রা। সবার মন খারাপ হচ্ছিল আব্বার লাশ আর পাওয়া যাবে না বলে – কিন্তু কিছুটা স্বস্তি এসেছিল মনে এ ভেবে – প্রতিদিন অসংখ্য বিভৎষ লাশ দেখতে হবে না আর। মা মেঝ বোনকে ধরে হাটছিলেন আর বারবার পিছলে পড়ে যাচ্ছিলেন।

যখনও আমার বয়স তেমন হয়নি যে বুঝতে পাড়বো যে মার গর্ভে আরও একটা সন্তান নিয়ে বিপদসংকুল এ পথ পাড়ি দিচ্ছিলেন। যেখানে একবার পা পিছলালে ২০/৩০ ফুট নিচে পড়ে একটা ভয়াবহ অবস্থা হবে। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে যখন আমার ছোট ভাইয়ে জন্ম হয় তখন বুঝেছিলাম কি বিপদসংকুল সময় না অতিক্রম করেছি আমরা।

টরন্টো
আগস্ট ০৩, ২০০৪

লেখক পরিচিতিঃ লেখক একজন পরিবেশ বিজ্ঞানী, সম্পাদক, সুদক্ষ কলামিস্ট। সপরিবারে কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনাব আ.স.ম. জিয়াউদ্দিন সুশীল পাঠকসমাজ নন্দিত, জনপ্রিয় বাংলা ওয়েবসাইট ‘সদালাপ’ এর সম্পাদক। তাঁর বিশেষ সৃষ্টি একাত্তরে পাকসেনাদের বর্বোরচিত গণহত্যার উপর সচিত্র পত্রদলিল ‘ওয়ার ক্রাইম ঃ প্রেক্ষিত ১৯৭১’

স্বাধীনতার বেদিমুলে

মোঃ ফরহাদ হোসেন

বাংলাদেশের ইতিহাসে এটাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সময় অথবা সর্বনিকৃষ্ট সময়। ১৯৭১ সনের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে দ্রুতগতিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘটনাপ্রবাহ এগিয়ে যেতে থাকে। সব ঘটনাপ্রবাহগুলো ছিল আনপ্রিডিকটেবল। সর্বোৎকৃষ্ট সময় এই জন্য যে, সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিবর্ণ আঁখিপাতে দেখা দেয় দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন স্বাধীনতা। কবির ভাষায় "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায় "। সর্ব নিকৃষ্ট সময় এই জন্যই যে, সামরিক জান্তার বিবেকহীন কুশাসনে জঘন্যতম শিকার হচ্ছিল বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ। রাষ্ট্র গড়ে তোলার সব ধরণের উপাদান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেয় আমরা ছিলাম বঞ্চিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার চূড়ান্ত রূপদান করেন বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন যা আজ সমগ্র পৃথিবীতে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনে যুক্ত ফ্রন্টের জয়লাভ, ১৯৬৬ সালে গণবিরোধী হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ৬৯-এর আইয়ুব বিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান, ৭৯-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নিরঙ্কুশ বিজয় সর্বোপরি ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাসের সোপান বেয়ে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

স্বাধীনতা দিবসে যে সমস্ত মহান ব্যক্তিত্বের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় তার মধ্যে মনের মুকুরে ভেসে উঠে শতাব্দির মহা নায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ট বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্টভাবে স্বাধীনতার রূপরেখা সাড়ে সাত কোটি মানুষের কাছে তুলে ধরেন। এর পর স্মরণ করতে হয় প্রবাসী মুজিব নগর সরকারের চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, কামরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন মনসুরের অবদান। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক আতাউল গনি ওসমানী, কুতোভয় সৈনিক মেজর জিয়াউর রহমানের অবদান অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। স্বাধীনতার বেদিমূলে অন্যান্য যে সমস্ত ব্যক্তিত্ব আত্মহুতি দিয়েছিলেন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জাতি তাঁদের স্মরণ করবে। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭১-এর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের আন্দোলন, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের, অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর, পরাধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমরা ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলেও অর্জন করেছি সবুজ, লাল রঙ্গে রঞ্জিত পতাকা ও মানচিত্র। ৩০ লক্ষ শহীদ ও পৌনে তিন লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা। স্বাধীনতার বেদিমূলে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন স্বাধীনতা দিবসে-বিজয় দিবসে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদেরকে আমরা স্মরণ করি।

(২)

স্মৃতিপটে মুক্তিযুদ্ধ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের পর পঞ্চগড় শহরে প্রচন্ড আলোড়ন, চতুর্দিকে সাজ সাজ রব। পঞ্চগড় থানার মাঠে শুরু হল আমাদের অস্ত্র ছাড়াই প্রাথমিক প্রশিক্ষণ। মাঝে-মধ্যে থ্রি-নট-থ্রি নিয়ে কুজকাওয়াজ। এরপর ঈদগা মাঠে। কিছুদিন পরেই জানতে পারলাম সৈয়দপুর থেকে বিশাল হানাদার বাহিনী পঞ্চগড় শহরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার অভিলাষ নিয়ে এগিয়ে আসছে। সম্মুখ যুদ্ধে এই বাহিনীর মুখোমুখি হওয়া সম্ভব নয় বিধায় তদানিন্তন নেতৃবৃন্ধ আমাদেরকে আত্মগোপন করার পরামর্শ দিলেন। হাজার হাজার পরিবার অসহায় অবস্থায় ভারতীয় বর্ডারের দিকে এগিয়ে চলছে। সে এক বেদানাদায়ক অবর্ণনীয় দৃশ্য। কখন কোথায় এবং কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করবো, তেঁতুলিয়া থানার অন্তর্গত হাড়াদীঘি গ্রামে অবস্থানরত অবস্থায় বুঝে উঠতে পারলাম না। শুধুমাত্র একটি সার্ট ও প্যান্ট নিয়ে পরিচিত এক বন্ধুর সাইকেলে চড়ে মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রের খোঁজ খবর পেলাম না। তখন চতুর্দিকে চলছিলো এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। এদিকে মা-বাবা ভাইবোন সবার থেকে বিচিছন্ন হয়ে পড়ি।

অবশেষে জুলাই মাসের প্রথম দিকে পশ্চিম বাংলার অন্তর্গত রাজগঞ্জ শহরের অদুরে অস্থায়ীভাবে স্থাপিত মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রে যোগদান করি। অস্ত্র ছাড়াই সেখানে প্রশিক্ষণ চললো প্রায় এক মাস। এর কিছুদিন পর মুল ট্রেনিং দেওয়ার উদ্দেশ্যে কয়েকটি বড় মিলিটারী গাড়িতে আমাদের তুলে দেওয়া হলো। যাত্রা শুরু হলো সন্ধ্যার দিকে। দীর্ঘ পাহাড়ি এলাকা অতিক্রম করে রাত ৩টা অথবা ৪টার দিকে পৌঁছলাম চতুর্দিকে পাহাড় ও চা বাগান বেষ্টিত এক উপত্যকায়। তখন আমি একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। স্মৃতি অনেকটা ঘোলাটে হয়ে গেছে। তাই সেই ট্রেনিং কেন্দ্রের নাম এ মুহূর্তে মনে পড়ছেনা। সে সময় শেখ কামালও আমাদের সাথে ট্রেনিং গ্রহন করেছিলো। প্রতিদিন নিজেদের প্রয়োজনে কাঠ বহন করে নিয়ে আসতে হতো দুরবর্তী পাহাড় পরিবেষ্টিত জঙ্গল থেকে। তাতে বেশ কষ্ট হতো। এরপর শুরু হলো আসল ট্রেনিং। প্রথমদিকে শুধুমাত্র শারিরীক কসরত। ক্রস কান্ট্রি দৌড় ছিলো নিত্যনৈমিত্তিক। বিভিন্ন বাঁধা অতিক্রম করা দড়ির সাহায্যে লাভ দিয়ে সুড়ঙ্গা পথ অতিক্রম করা ইত্যাদি। এরপর পর্যায়ক্রমে শুরু হলো বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র প্রশিক্ষণ। থ্রি-নট-থ্রি, এস,এম,জি, এস-এল-আর, এইচ-এম-জি, টু ইনচ্ মর্টার, থ্রি ইনচ্ মর্টার, গ্রেনেড থ্রোয়িং ইত্যাদি সামরিক কায়দায় প্রশিক্ষণ।

গ্রেনেড থ্রোয়িং এর প্রশিক্ষণে বেশ আতঙ্ক ও উত্তেজনা বিরাজ করতো। এটা বেশ ঝুঁকিবহুলও ছিল বটে। ট্রেনিং চলাকালীন সময়ে সামান্য একটু গাফলতির জন্য শাস্তি পেয়েছি। ট্রেনিং সমাপনে প্রায় ২০০ জনের মত মুক্তিযোদ্ধা রংপুরের অন্তর্গত হাতীবান্ধা এলাকার নিকটস্থ ভারতীয় বর্ডারে নামিয়ে দেওয়া হয়। এর কিছুদিন পর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছাতনাই এলাকায় ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এখান থেকেই আমরা বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণ করতাম। প্রাথমিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের মুল উদ্দেশ্য ছিলো শত্রুপক্ষের উপর আক্রমন চালিয়ে ঘায়েল করা অথবা উত্যক্ত করে রাখা। ছাতনাই থেকে কিশোরগঞ্জ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে অত্যন্ত ঝুঁকিপুর্ণ অনেকগুলো অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছি। দীর্ঘ তেত্রিশ বছর পর সে জায়গাগুলোর নাম আজ আর মনে করতে পারছিনা। রাতের অন্ধকারে এস-এম-জি কাঁধে নিয়ে হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি পরে ১০/১২ জনের একটি দল বেরিয়ে পড়তাম।

মাঝে-মধ্যে বহন করতাম এস-এল-আর। এল-এম-জি র দায়িত্ব দেওয়া হতো একটুখানি শক্তিশালী ও বয়স্ক মুক্তিযোদ্ধাদের। সর্বত্রই আমাদের জয়-জয়কার ছিলো। কিন্তু মাঝে-মধ্যে ভাবনায় পড়তাম ভিয়েতনামের মতো দীর্ঘ মেয়াদে এই গেরিলা যুদ্ধ চলতেই থাকবে হয়তো।

পরম করুনাময় আলাহতালার অসীম রহমতে ৯ মাসেই এই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হানাদার বাহিনী হটিয়ে কিছু এন্টি ট্যাঙ্ক মাইন উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছিলো। গ্রামবাসীদের রক্ষা করাই ছিলো আমাদের মুল উদ্দেশ্য। দুভাগ্যবশত উদ্ধারকৃত ঐ সমস্ত এ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইনগুলোর বিস্ফোরণে ১৮ জন মুক্তিযোদ্ধা মারা গিয়েছিলো। সেই ছাতনাই এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে উহাই ছিলো সবচেয়ে বড় মর্মান্তিক ঘটনা। যা আমাকে আজও শিহরিত করে। ব্যথিত করে। এ ছাড়াও সামনাসামনি যুদ্ধে আমাদের অনেক মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন। আমার চেনা-জানা এক পোষ্টমাস্টারের একমাত্র পুত্র আফজাল হোসেনের কথা মনে হলে এখনও মনটা বেদনায় নীল হয়ে উঠে।
তারপরও হুকুমজারি হলো সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার। সর্বশেষ অবস্থান করি নীলফামারী শহরের অদুরে পরিত্যাক্ত এক হাসপাতালে। নীলফামারী শহরে স্থাপিত মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন ফ্লা-লেঃ ইকবাল। এরই নেতৃত্বে একদিন কিশোরগঞ্জ এসে আর্মস জমা দিয়েছি।

দীর্ঘ ৯ মাসের অভিজ্ঞতা বড় তিক্ত ও বেদনাদায়ক। যাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম তাদের অনেকেই মুক্ত দেশে আর ফিরে আসেনি। তাঁরা তাদের বুকের রক্ত ঢেলে এই বাংলার মাটিকে সিক্ত করে স্বাধীনতার জন্যে উর্বর করে দিয়ে গেছে। স্বাধীনতার বেদীমুলে আত্মাহুতি দিয়ে তাঁরা হারিয়ে যায়।
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিলো অন্যায়ের বিরূদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম, অসত্যের বিরূদ্ধে সত্যের, অন্ধকারের বিরূদ্ধে আলোর, অসুন্দরের বিরূদ্ধে সুন্দরের। ব্যক্তিগত পর্যায়ে ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলেও এই মুক্তিযুদ্ধ সামগ্রিকভাবে দেশের অনেক মঙ্গল ডেকে এনেছে। মুক্তিযুদ্ধের ফসল স্বরূপ দেশ পেয়েছে একটি মানচিত্র ও পতাকা। বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্বাধীনতা অর্জন করার চেয়ে রক্ষা করা অধিকতর কঠিন। এই পবিত্র দায়িত্ব আমরা অর্পন করছি আমাদের উত্তরসুরীদের কাছে................।।

লেখক পরিচিতিঃ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, রিয়াদ এর নাইন টার্মের প্রিন্সিপাল ইন চার্জ সদ্য প্রয়াত (১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪ইং বুধবার বিকেল ৫ঃ২৬মিনিটে রিয়াদের আল ওবায়েদ হাসপাতালে হৃদযন্ত্র ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।) বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, লেখক, ইংরেজীর অধ্যাপক মোঃ ফরহাদ হোসেন বঙ্গবন্ধুকে **জাতির জনক** বলেই সর্বত্র অকপটে উচ্চারণ করতেন। ছিলেন একজন আপসহীন সত্যের সৈনিক। এতেই তিনি স্কুল পলিটিক্সের শিকার। চাকরী হারিয়ে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করে গেছেন। দীর্ঘকাল চেষ্টা করেও হৃতমর্যাদা পুনুরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। এই ঘুণে ধরা সমাজ তাঁকে বিন্দুমাত্র সহমর্মিতাও দেখায়নি। তাই যখন সপরিবারে কানাডা চলে যাবার জন্যে সব ঠিক করেও ফেলেন। কিন্তু চিরসত্য মৃত্যু তাকে কানাডা যেতে দেয়নি। অশুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে যে দেশটি স্বাধীন করেছিলেন, সে দেশের মাটিও তার সৌভাগ্যে হয়নি। তাকে দাফন করা হয়েছে এই রিয়াদেই। তবে তার বিদুষী স্ত্রী ও তাঁর এক ছেলে এক মেয়ে তাঁকে দাফন সমাপনে কানাডা চলে যায়। এই লেখাটি আমাকে প্রকাশের জন্যে দিয়ে জনাব ফরহাদ বলেছিলেন, যতদিন তিনি রিয়াদে আছেন ততদিন যেন আমি এই লেখাটি প্রকাশ না করি। তাঁর ভয় ছিলো এতেও তিনি বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক বলেছেন। কেননা তাঁর স্ত্রী তখনও অত্র স্কুলে শিক্ষকতায় নিয়োজিত। হ্যাঁ আমি অধ্যাপক ফরহাদ হোসেনের সে কথা রেখেছিলাম।-সম্পাদক।

মুজিব মানেই স্বাধীনতা...মুজিব মানেই বাংলাদেশ

সদেরা সুজন

জাতির জীবনে একটি কলঙ্কিত ও শোকাবহ দিন ১৫ আগষ্ট, সবচেয়ে বেদনাবিধুর দিন। মানব সভ্যতার ঘৃণ্যতম হত্যাকান্ড ঘটেছিল ১৯৭৫সালের ১৫ আগস্টের এই দিনে। আগষ্ট রক্তাক্ত স্মৃতিময় ও মর্মান্তিক শোকের মাতম করা মাস। বাঙালির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল একটি ঘাতক চক্র হত্যা করেছিল শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহানায়ক ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

৪৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত ইতিহাসে পাতা খুললেই দেখা যাবে এদেশের মানুষের প্রতিটি দ:সহ দুর্দিনে, দুর্যোগে দু:খে, আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে যে মানুষটি একদা সকলের প্রিয় মুজিব ভাই থেকে দেশের আপামর জনসাধারণের শ্রদ্ধাসুচিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুতে যাঁর উত্তরণ ঘটেছিল নিখাদ শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায়। তিনিই শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীনতার স্বপ্ন পুরুষ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৯ তম শাহাদাত দিবস। জাতীয় শোক দিবস। এ শোকের মাঝে বাঙালি জাতির শুধু কান্না প্রবাহই সৃষ্টি করে না উত্তাল দু:খবোধের বাসও এ শোকের মাঝে আছে চিরঞ্জীব মহাত্মাজীবনকে স্পর্শ করার দৃঢ় প্রত্যয় ও ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায়। এমন দিনে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি ও রূপকার, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৯তম শাহাদাত বার্ষিকীতে সমগ্র জাতির সঙ্গে আমরা প্রবাসীরাও শোকাতুর। যে নেতার জন্ম না হলে হয়তো বাংলাদেশের মতো একটি স্বাধীন সার্বভৌমত্ব দেশ পেতাম না আর আমরা বাংলাদেশের সবুজ পাসপোর্ট সঙ্গে করে এই প্রবাসে বসবাস করার সুযোগও হতো না। শেখ মুজিব মানেই আমাদের অস্তিত্ব ও পরিচয়।

১৯৭৫ এর আগষ্ট মাস বাঙালির ব্যর্থতার ইতিহাস, শৌর্যবীর্য হারানো লজ্জার ইতিহাস, ধিক্কার দেওয়ার ইতিহাস। বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিপথে যাবার ইতিহাস, মুক্তিযোদ্ধা লাঞ্চিত হবার ইতিহাস, বাংলাদেশেকে ধ্বংস করার ইতিহাস, মৌলবাদীদের উত্থানের ইতিহাস, খুন-সন্ত্রাস আর ধ্বংসের ইতিহাস। স্বৈরাচারী, খুণি ঘাতকের উত্থানের দেশ এখন বাংলাদেশ।

আমরা বাংলাদেশের জন্ম দেখেছি। আমরা বাংলাদেশ জন্মের ইতিহাসও জানি, এ ইতিহাস কোন খুনি রাজাকার- আলবদর, কোন ক্ষমতালোভী স্বৈরাচারী ঘাতক অথবা কোন পতিতা বুদ্ধিজীবি তৈরী করতে হবে না। আমরা যা লেখি তাও ইতিহাস হতে পারে। সেই ইতিহাসই সত্যি ও নির্ভেজাল। আর সে ইতিহাসের কথা লেখতে গিয়ে আমরা কোন ক্ষমতার মোহে নয়, আর্থিক লাভবানে নয় শুধুই মানবিক কারনে।

আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি। আমরা দেখেছি লাখ লাখ মানুষের হত্যা যজ্ঞ আর মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের কষ্টার্জিত আর রক্তার্জিত স্বাধীনতা। আমরা দেখেছি একাত্তরের বিভীষিকাময় গণহত্যার দিনগুলো। আমরা হারিয়েছি সহায়সম্পত্তি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাতে কোন মতানৈক্য কিংবা কোন দ্বিধাদ্বন্ধ থাকতে পারে না।

সেই দিনগুলোতে শেখ মুজিব ছাড়া আর কাউকে বাংলাদেশের জনগণ নেতা হিসেবে পায়নি এবং নেতা হিসেবে মনেনিও। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই আওয়ামীলীগের পক্ষে নৌকা মার্কা নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলো সেদিন কোন মেজরের ছায়াও জনগণ দেখেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে সাতাশটি বছর কেউ জেল কাটেননি একমাত্র শেখ মুজিব ছাড়া। সেই দু:সহ দুর্দিনে বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবই ছিলেন জাতির নেতা , আশা ও নির্দেশনার একমাত্র অবলম্বন।

১৯৭১ এর ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে লাখো মুক্তকামী মানুষের সামনে যে ভাষণ দিয়ে সারা দেশবাসীকে উদ্দিপ্ত আর সংগ্রামী করে তুলেছিলেন তিনি কোন মেজর জেনারেল নয় তিনি বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সেদিন বলেছিলেন হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ পংক্তিমালা "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।" এরকমের ত্যাজোদীপ্ত বাণী কেউ ছড়াতে পারেনি সেদিন। পাকিস্তানের সামরিক জান্তারা যদি কোন নেতাকে ভয় করে থাকে তাহলে একমাত্র শেখ মুজিবকেই করেছে। পাকিস্তানের সামরিক হায়েনারা যদি গ্রেফতার করে ফাঁসির মঞ্চ তৈরী করে থাকে তাহলে শেখ মুজিবকেই করেছে কোন অখ্যাত মেজরকে করে নাই।

১৯৭১ সালের সেই ভয়াবহ যুদ্ধের দিনে সারা পৃথিবীর পত্র-পত্রিকা তথা বিশ্ব মিডিয়াই বাংলাদেশের গণহত্যাযজ্ঞের ঘটনা তুলে ধরে বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কথা তুলে ধরেছিল কোন মেজরের নাম তুলে ধরেনি। সেদিন ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে যে সংগ্রাম করেছিলো তা **জয় বাংলা** আর **জয় বঙ্গাবন্ধু** শোগানে। সেদিন মুক্তিযোদ্ধা আর স্বাধীনতাকামী মানুষের পক্ষে যে শোগান তোলা হয়েছিল"তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব"জেলের তালা ভাঙ্গাবো শেখ মুজিবকে আনবো", এসব শোগানে কোন মেজর জেনারেলের নাম সেদিন ছিলো না।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামে যে গানগুলো মুক্তিকামী মানুষের মনে সাহস যুগিয়েছিলো প্রাণে যুগিয়েছিল যুদ্ধে যাবার প্রেরণা, সেই গান গুলো "মুজিব বাইয়া যাওরে/নির্যাতিত দেশের মাঝে জনগণের নাও ওরে মুজিব বাইয়া যাওরে ''শোন একটি মুজিববের থেকে... লক্ষ মুজিববের কণ্ঠ স্বরের ধ্বনি"...আরো কতরকম সংগ্রামী গান ছিলো মুজিবকে ঘিরে। সেদিন কোন মেজরকে ঘিরে কোন গান ছিলো কি? তারপরে ও বলে দিতে হবে কি কে স্বাধীনতার মহানায়ক? কে স্বাধীনতার ঘোষক? কে বাংলাদেশ নামের দেশটির প্রতিষ্ঠাতা?

একটি দেশের জন্য, একটি জাতির জন্য, একটি ভাষার জন্যে যে নেতা বছরের পর বছর জেল- জুলুম নির্যাতন ভোগ করেছেন তিনি বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে যারা বিতর্ক সৃষ্টি করছেন তারা নিজে তো বিতর্কিত। সুতরাং বঙ্গাবন্ধু ছাড়া বাংলাদেশের কোন শুদ্ধ ইতিহাস তৈরী হতে পারে না, বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মহানায়ক ও ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কিন্তু অপ্রিয় সত্য যে, বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজের জীবন দিয়ে বাংলাদেশ সৃষ্টি করলেও অত্যন্ত দু:র্ভাগ্য যে বাংলাদেশে তিনি বেশীদিন বেঁচে থাকতে পারেন নি, ঘাতকরা বেঁচে থাকতে দেয় নি। সেটার কারণ তাঁর উদারতা ও অবিশ্বাস্য ভালোবাসা আর বিশ্বাস। তিনি জানতেন না শয়তান কখনো মানুষ হয় না,

হায়না পশু কখনো মানুষের উপকারীতাকে শ্রদ্ধা জানাতে জানে না। যার ফলেই দেশ স্বাধীন হবার কিছু দিনের মধ্যেই স্বাধীনতা বিরোধী দেশী বিদেশী ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যাকরে এবং হত্যার বিচার রহিত করে ইনডেমেনিটি নামের একটি কালো আইন করে যা বিশ্বের কোন দেশে নেই।

আজ বঙ্গবন্ধু হত্যার ২৯ বছর পর এই প্রবাসে অবস্থান করে একটি কথা আমার বার বার মনে হচ্ছে এবং আমাকে ভীষন কষ্ট দিচ্ছে যে, বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবন দিয়ে বাংলাদেশ সৃষ্টি করলেও দেশটা মুলত স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকচক্র, সুবিধালোভী রাজনীতিবিদদের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। ভাগ্যক্রমে তারাই এখন মালিক। পরিশেষে বলতে চাই, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে কোন বিতর্ক থাকতে পারে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক, স্বাধীনতার ঘোষক, বাংলা ভাষাভাষী মানুষের অবিসংবাদিত নেতা ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। তাঁর ২৯ তম শাহাদাত দিবসে, জাতীয় শোক দিবসে সারা দেশের মানুষের সঙ্গে এই প্রবাসে আমরাও শোকাবহ, বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টে নিহত সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে হন্তারকদের ফাঁসি দাবি করছি।

মন্ট্রিয়ল, কানাডা
৭. ৮. ২০০৪ইং

(২)

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক

যেখানে সোনালী ধানের ক্ষেত আছে, সবুজ বনানী আছে, সরিষার হলুদিয়া ফুল আছে, কোকিলের সুমধুর ডাক আছে, বহমান নদীর স্রোত আছে, যুবার মুষ্টিবদ্ধ হাতে সাহসী শোগান আছে, অবুজ শিশুর মুখে হাসি আছে, মায়ের চোখে জল আছে, অমাবশ্যার পরে চাঁদনী রাত আছে, স্বাধীন ভৌগলিক মানচিত্র আছে, সবুজের মধ্যে সূর্য খচিত পতাকা আছে, একটি নিজস্ব জাতি আছে, একটি জাতীয়তাবাদ আছে, একটি রক্তাক্ত ভাষা আছে, সেখানে একটি স্বর্ণালী ইতিহাসও আছে। সেই ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জল সম্রাটের নামও আছে। যে নামটি মিশে আছে এসব পংক্তিতে সেটা হলো বাংলার মুকুট বিহীন সম্রাট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আবারো ফিরে এসেছে জাতির ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় দিন। ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫। যে তারিখে রাতের আঁধার ভেঙ্গে পাঁজরের হাড় কাঁপিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী, বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানের দোসর, নরপিশাচরা হত্যা করেছিলো স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা হাজার বছরের সূর্য সন্তান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। হত্যা করলো হাজার বছরের বাংলা ও বাংলা ভাষাভাষী মানুষের অস্তিত্ব বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে।

যে ব্যক্তিকে ঘিরে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী একদিন স্বপ্ন দেখেছিলো মুক্তির, স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং একটি সুন্দর দেশ গড়ার। সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিলো স্বাভাবিক পথে নয়, ত্রিশ লক্ষ শহীদ দুলক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম খুব কমই ঘটনা আছে যে একজন ব্যক্তিকে ঘিরে কোটি কোটি মানুষ আন্দোলিত হবার ঘটনা।
তাইতো খ্যাতিমান ফরাসী দার্শনিক আর্দেমার্লোর বলেছিলেন- 'মুজিবকে শুধুমাত্র একজন রাষ্ট্র নায়ক হিসেবে ভাবা যায় না, তাঁকে দেখা যায় বাংলার প্রকৃতি আকাশ বাতাস পাহাড় পর্বত বৃক্ষরাজি শস্যক্ষেত্র

প্রভৃতির মাঝে'। আর ভারতের বিখ্যাত কণ্ঠ শিল্পী প্রয়াত হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন- 'এত বিশাল হৃদয়ের বাঙ্গালী তার জীবনে আর আসেনি এবং আসবেও না, তাকেই তোমরা শেষ করে দিলে', আর উপমহাদেশের খ্যাতিমান লেখক ও কবি প্রয়াত অন্নদা শংকর রায় হৃদয় আপ্লুত করা একটি কবিতা লিখেছিলেন বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে 'যতদিন রবে পদ্মা-মেঘনা যমুনা-গৌরী বহমান/ ততদিন রবে কৃতি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান / দিকে দিকে আজ অশ্রু গঙ্গা রক্ত গঙ্গা বহমান/ নাহি নাহি ভয়, জয় জয় মুজিবুর রহমান।'

এছাড়া পৃথিবীর একমাত্র রাস্ট্রনায়ক এবং একটি দেশের স্থপতিকে নিয়ে এত হাজার হাজার কবিতা প্রবন্ধ আর গল্প লেখা হয়েছে যা আর পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে লেখা হয়নি আর তিনি বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা, বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই বলতে হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কত বড় নেতা ছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়।

১৫ই আগস্ট ৭৫ থেকে ১৫ই আগস্ট, ২০০৪। দীর্ঘ ২৯ বছর। কিন্তু আজো মুজিব হত্যার বিচার হলো না। বিচার হলো না বঙ্গ জননী ফজিলাতুন নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর ছেলে মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল, শেখ জামাল এবং ১০ বছরের অবুঝ শিশু সন্তান শেখ রাসেল হত্যার।

বিচার হলো না তাঁদের যাঁদের হাতের মেহেদীর রং বুকের তাজা রক্তে মিশে একাকার হয়েছিলো, সেই সুলতানা কামাল ও রোজি জামাল হত্যার। বিচার হলো না বঙ্গবন্ধুর ভ্রাতা শেখ আবু নাসের, সামরিক বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জামিল, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি, তার অন্তঃস্বত্তা স্ত্রী আরজুমনি, কৃষক নেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, তার কন্যা বেবী, শিশুপুত্র আরিফ, সেরনিয়াবাতের জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল হাসনাত আব্দুলাহর জ্যেস্ঠ্য সন্তান চার বছরের সুকান্ত, তার ভ্রাতুস্পুত্র সাংবাদিক শহীদ সেরনিয়াবাত ও নান্টু সহ বহু আত্মীয় স্বজন এবং বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার হত্যার।

'কত বিচিত্র এ দেশ, কত বিচিত্র এ দেশের মানুষ, সেলুকাস! আজো মুজিব হত্যার বিচার হয়নি। জানিনা এসব হত্যার বিচার কবে হবে এ বাংলার মাটিতে। সে সব হত্যার খুনী ডালিম ফারুক চক্র এখনও বহাল তবিয়তে আছে। খুনীদের দীর্ঘ ষড়যন্ত্রে বদলে গেছে স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস। যে মুজিব না হলে বাংলাদেশের মতো একটি দেশ হতো না, যে মুজিবের ত্যাগ আর দৃঢ় প্রত্যয় আর সংগ্রাম না করলে হয়তো আজো আমরা পাকি হিসেবে পরিচয় দিতে হতো।

সেই স্বাধীনতার স্রষ্টা-পুরুষ স্বাধীনতার ঘোষক ও বাংলাদেশের স্থপতিকে নিয়ে চলছে নির্লজ্জ মিথ্যাচার আর প্রতি নায়ক হয়েছেন নায়ক, মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার ***জয় বাংলা*** শোগান হয়েছে নিষিদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাপক্ষের লোকদের মধ্যে হয়েছে বহুধাবিভক্ত, মৌলবাদীরা চেয়ে গেছে তাবৎ দেশ। শুধু দলের নাম ভিন্ন কিন্তু আদর্শ আর লক্ষ্য অভিন্ন। স্বাধীনতার ইতিহাস নির্লজ্জভাবে বিকৃত করা হয়েছে।

৭৫এ জন্ম নেয়া শিশুটি আজ যুবা, সে যুবা জানে না তার প্রকৃত ইতিহাস, সে হয়তো জানে না সাহসী মুজিবের কথা, সে জানে না মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবাদর্শের কথা, কারণ পদে পদে সে যুবা বিভ্রান্ত হয়েছে ধর্মব্যবসায়ী আর স্বৈরাচারী গদিয়ানদের মিষ্টি মিষ্টি বুলিতে।

সে যুবা হয়তো জানে না বঙ্গবন্ধুর সেই বিপবী চেতনায় বাংলার মাটি মুক্তির অপরিমেয় শক্তি ও সম্ভাবনার পথ উন্মোচনের কথা। সত্যি কথা বলতে কি, প্রগতির অন্তঃকলহে স্বাধীনতার শত্রুরা বঙ্গবন্ধুর

মহান হৃদয়ের সুযোগ সাধারণ ক্ষমার অজুহাতে পার পেয়ে ঘাতকের শাণিত ছুরি দিয়ে ফালি ফালি করে কাটছে গণ মানুষের ভিত।

যে নেতাকে আটকে রাখতে পারেনি আইয়ুবের কামান, আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলা, যে নেতা ফাঁসির মঞ্চে গিয়েও বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন 'আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা' ৭ই মার্চ রেসকোর্সের লাখো মানুষের সামনে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।' সেই মহান নেতা জনকের নাম তার রেখে যাওয়া গণমাধ্যম রেডিও টেলিভিশনে আবারো এখন একটি নিষিদ্ধ উচ্চারণ।

১৯৯৬ এ জনগণের মেন্ডেট নিয়ে বঙ্গবন্ধুর তনয়া জননেত্রী শেখ হাসিনা তথা অওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়ে পৃথিবীর জঘন্যতম কাল আইন ইনডেমনিটি বাতিল করে জনক হত্যার বিচার কার্য শুরু করলেও আজোবধি বিচার সম্পূর্ণ হয়নি। ১৯৭৫-এ কালো আইন করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার থেকে অব্যাহতি দেয়া হযেছে ঠিক, কিন্তু জনতার হৃদয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীরা হত্যাকারী হিসাবেই চিহ্নিত থাকবে চিরকাল। আর এ জগন্যতম হত্যাকান্ডের কোন ক্ষমা নেই। বিচার হবেই। যত দেরীই হোক না কেন, কারণ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব সাধারণ মানুষের নীরব চোখের জল বৃথা যেতে পারে না।

সুতরাং বলবো, আমরা ধৈর্য হারাইনি, কারণ ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ঘটনা আমাদের স্বাধীনতা। আর বঙ্গবন্ধু সেই মুজিব স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য নায়ক। তাই বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু বার্ষিকী জাতীয় শোক দিবসে তাবৎ বিশ্বে সববাসকারী বাংলা ভাষাভাষী মানুষ জাতির জনক হত্যার বিচার চায়।

আজ এই প্রবাসের মাটিতে থেকে আমরা বিচার চাইবো ১৫ই আগষ্টে বঙ্গবন্ধুসহ নিহত সকলের। আজ মৃত মুজিব জীবিত মুজিবের চেয়ে শক্তিশালী আমাদের মাঝে। তাই আমি বলবো মুজিবের মৃত্যু নেই। মুজিবাদর্শের মৃত্যু নেই। হতে পারে না। তাই আমরা যেখানে যে দেশে যে ভাবেই থাকি না কেন আমাদের পরিচয় এই বলে দিতে চাই, কবির ভাষায়- 'আমাদের নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমরা মুজিবেরই লোক'।

সদেরা সুজন / ফ্রিল্যান্স সংবাদপত্র কর্মী
মন্ট্রিয়ল/ ৮.৮.২০০৪,কানাডা।

একাত্তরের স্মৃতি

নুরুলাহ মাসুম

*{একাত্তরের স্মৃতি নিয়ে এত শীঘ্র লেখার তেমন একটা ইচ্ছে ছিল না। রিয়াদ থেকে প্রকাশিত **‘মরুপলাশ’** সম্পাদক ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত সাহেবের তাগিদের জন্য লিখতে বসলাম। আমার লেখা গদ্য তেমন একটা ভাল না। সে কারণে সাহিত্য চর্চা তেমন একটা হয়ে ওঠেনি। বড়ই রসকষহীন আমার লেখা। কখনও বা লেখার কোন ধারাবাহিকতাও বজায় থাকে না। তদুপরি বুকভরা সাহস নিয়ে কীবোর্ডে হাত রাখলাম। আমার এ লেখা একান্তই আমার দেখা / জানা অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা। এখানে কোন প্রকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা বিতর্ক যাতে না আসে সে বিষয়ে পাঠকের (যদি লেখাটা ছাপার অক্ষরে দেখা যায় তখনই পাঠক তা পড়বেন) প্রতি অনুরোধ রইল।}*

পুর্বকথাঃ

১৯৬৪ বা ৬৫ সাল। আমরা তখন খুলনার ঝাউডাঙ্গা নামক এলাকায় বাস করি। আমার বাবার চাকরির সুবাদে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসের এক পর্যায়ের ঘটনা সেটি। স্মৃতিতে এখনো ঝাপসা হয়ে ভাসে পাক-ভারত যুদ্ধ। বয়সে একেবারেই শিশু। বিস্তারিত বলতে পারবো না। দেখেছি ভারতীয় বিমানকে ধাওয়া করছে পাক যুদ্ধ বিমান। আমরা বিকেলে স্কুল মাঠে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পাক-ভারত যুদ্ধ যুদ্ধ খেলেছি তখন। সে সময়েই প্রথম শেখ মুজিবের নাম শুনি। যদিও ঘটনাটা আরো আগের (১৯৬৩ সালের) আমার অগ্রজ বোনের কাছে শুনি সোহরাওয়ার্দি বিদেশে মারা গেছেন, শেখ মুজিব খুব করে কেঁদেছেন। কেন? জানতে চাইলে বোনটি আমাকে বলল, সোহরাওয়ার্দি ছিলেন শেখ মুজিবের ওস্তাদ। কে এই শেখ মুজিব? তিনি আওয়ামী লীগের নেতা। আওয়ামী লীগ কি, রাজনীতি কি, সেটা বোঝার বয়স তখনো হয়নি। তবে এটা বোঝানো হয়েছিল তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বড় নেতা।

১৯৬৭/৬৮ সালের দিকে মাওলানা ভাসানীর নাম শুনি আমার বড় ভাইয়ের মুখে। তিনি ভাসানী ন্যাপ করতেন। তিনি বলতেন ভাসানীই হচ্ছেন শেখ মুজিবের আসল ওস্তাদ। পরে জেনেছি ভাইটি ছিলেন আন্ডার-গ্রাউন্ড কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য। এ সময়টাতে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নামের সাথে পরিচিত হই। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ মোজাফ্ফর, ন্যাপ ভাসানী, পিডিপি, নেজামী ইসলামী প্রভৃতি। বড় ভাই বলতেন আওয়ামী লীগ হচ্ছে সবচেয়ে বড় দল। শেখ মুজিব সে দলের নেতা। মরহুম শেরে বাংলার নাম ততদিনে জেনে গেছি পাঠ্য বইয়ের সুবাদে। তিনি নাকি ৪০টি ফজলী আম খেতেন এক সাথে।
১৯৬৯ সালের কোন এক সময়। আমি আব্বা পরিচয় করিয়ে দেন স্থানীয় ন্যাপ নেতা জহুরুল হক লাল মিয়ার সাথে। তিনি ছিলেন মোজাফ্ফর ন্যাপের সাথে যুক্ত। আমার সেই কম্যুনিস্ট ভাইকেও দেখি সে সময়ে মোজাফ্ফর ন্যাপের হয়ে কাজ করতে। রাত জেগে তিনি পোস্টার লিখতেন। বড় বড় কাগজ। সে সময় অবধি লেখার জন্য “ফুলস্কেপ কাগজ” ছাড়া বড় আকারের কাগজ দেখিনি। তাই বেশ অবাক লাগতো অত বড় কাগজ দেখে। লেখার জন্য তিনি সবুজ আর লাল রঙের কালি ব্যবহার করতেন। আর লেখার জন্য ব্যবহার করতের খেজুর গাছের ডগা। মাথাটা থেতলে ব্রাশ বানাতেন। বহুদিন তাকে পোস্টার লিখতে দেখেছি। তার লেখা শোগানের মধ্যে মনকাড়া শোগান ছিল “কেউ খাবে তো কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না”। ওই শোগানটাই আমার রাজনৈতিক বিশ্বাসের গোড়াপত্তন ঘটায়।

তখন রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে শুনেছি কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার নাটক। কম্যুনিস্টরা দেশটাকে উচ্ছন্নে নিয়ে যাচ্ছে, ওরা দেশের শত্রু, এ ছিল নাটকের মুল বক্তব্য।

সময়টা ছিল আওয়ামী লীগের স্বর্ণযুগ। আকাশে বাতাসে ধ্বণিত হত আওয়ামী লীগ। তখন শুনেছি শেখ মুজিব দেশের জন্য জেল খাটছেন। কে যেন বলেছিল ষেখ মুজিব জীবনের ১৭/১৮ বছর জেল খেটেছেন। অবাক হতাম সে কথা শুনে, এক জন মানুষ কি কওে দেশের কাজের জন্য এতটা বছর জেল খাটতে পারেন! কেমন মানুষ তিনি! তদুপরি হয়তোবা স্রোতের বিপরীতে চলার স্বভাবের কারণে অথবা আমার প্রিয় শোগানের কারণে আমি সে সময়েই মোজাফ্ফর ন্যাপের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠি। যদিও রাজনীতি বোঝার বয়স তখনও হয়নি। আমাকে খেপানোর জন্য আমার ভাই-বোনেরা তখন শোগান দিত, “দাড়িপালা-কুড়ে ঘর, ভাইঙ্গা-চুইরা নৌকায় ভর”। মনক্ষুন্ন হলেও সহিংস হইনি কখনো। রাজনীতি না বুঝলেও সহনশীলতা ছিল আমার মধ্যে। সেটি আজও বজায় রয়েছে আমার চরিত্রের মধ্যে।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কথা মনে আছে। আমরা তখন গাববাড়ী নামক এলাকায় বসবাস করি। থানা সদর থেকে কেবল যোগাযোগ নৌকা অথবা পায়েহাটা পথ। তেমনি এক অজ পাড়া গাঁয়ে গণঅভ্যুত্থানের ঢেউ লেগেছিল। সেদিনের সে অভিজ্ঞতার আলোকে আজ বুঝতে পারি, সে অভ্যুত্থানের জোয়ার কতটা প্রবল ছিল। গ্রামের একমাত্র হাই স্কুলের সামনে গণ জমায়েত থেকে মিছিল এবং মিছিলের প্রারম্ভে আব্বার অফিসের সাইনবোর্ড খুলে ফেলা, মুহুর্মুহু শোগান, বক্তাদেও সুকঠিন বক্তব্য আজো স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে। শেখ মুজিব তখনো জেলে। “জেলের তালা ভাঙ্গাবো, মুজিব ভাইকে আনবো”, তোমার ভাই আমার ভাই-মুজিব ভাই-মুজিব ভাই” শোগান দু টি আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হতো সে সময়ে। সে সময়ে আব্বার মুখে শুনেছি, শেখ মুজিবকে ফাসি দেবার জন্য পাকিস্তানীরা ষড়যন্ত্র করছে। যদিও মোজাফ্ফর আহমদকে আমার নেতা মানতাম, শেখ মুজিবের ফাঁসি হবে জেনে মনে মনে কষ্ট পেতাম।
কয়েকদিনবাদেই শুনলাম পাকিস্তানীরা শেখ মুজিবকে ছেড়ে দিয়েছে। এর আগে পাকিস্তানেও প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান গদি ছেড়ে দিয়েছেন, নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ইয়াহিয়া খান। আমরা তার ছবি ও নাম নিয়ে তামাসা করতাম এভাবে, “আগায় খান-পাছায় খান, আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান”।

সত্তরের বন্যাঃ

সত্তরের প্রলয়ঙ্করী গোর্কির কথা আজও ভুলতে পারি না। ১২ নভেম্বর, সেদিন রাতে দেশের বিস্তীর্ণ উপকুল জুড়ে গোর্কি আঘাত হানে। কেড়ে নেয় ১০ লাখ বাঙালীর তরতাজা প্রাণ। দিনটি আমার প্রকৃত জন্মদিন। সে কারণেই হয়ত আজো দিনটির ভয়বহতা দগদগে আগুনের মত স্মৃতির পাতায় খোদাই হয়ে আছে। বাঙালী মাত্রেই জানেন, আমাদের জন্ম তারিখ দু'টি হয়। একটি প্রকৃত, যেদিন মায়ের কোলে জন্ম নেয় শিশুটি; অন্যটি কাগুজে, স্কুলের কেরাণী সাহেব নবম শ্রেনীতে অধ্যয়নকালে বোর্ডের রেজিস্টেশন পেপারে যে তারিখটি বসিয়ে দেন। বাস্তবে জীবনভর কেরাণী সাহেবের দেয়া জন্ম তারিখ নিয়ে আমাদের চলতে হয়। প্রকৃত জন্ম তারিখ ব্যবহার করতে হলে আসে নানান ঝামেলা। অগত্যা আজো আমি আমার দু'নম্বরী জন্ম তারিখ ব্যবহার করে চলেছি সর্বত্র।

১২ নভেম্বর আমার প্রকৃত জন্মদিন। কথা ছিল ঘরোয়া অনুষ্ঠান হবে। দিন তিনেক আগে থেকেই পুরো দক্ষিণ বাংলা জুড়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, মৃদু বৃষ্টি। আব্বা-আম্মাসহ আমরা সকলেই রেডিওর আবহাওয়া সংবাদের দিকে কান পেতে রইলাম। ক্রমে খারাপ সংবাদ আসতে থাকলো। ১০ তারিখ আমাদের এলাকা প্লাবিত হল। ঝড়ো হাওয়া ক্রমেই বাড়তে থাকলো।

১১ তারিখ দুপুর নাগাদ আমরা এলাকার একমাত্র পাকা ভবন, মডেল স্কুলের লাইব্রেরীতে আশ্রয় নিলাম। লাইব্রেরী বলতে শিক্ষকদের কক্ষ। পানি সেখানেও। শিক্ষকদের বড় টেবিলে আমাদের বিছানা হল পরবর্তী ৩/৪ দিন। দিন সাতেক পরে আব্বার মুখে শুনলাম বন্যায় (গ্রামাঞ্চলে বন্যা আর ঘুর্নিঝড়ের পার্থক্য নেই বলাতে) দশ লাখেরও বেশী মানুষ মারা গেছে। যদিও রেডিও পাকিস্তান সে কথা বলেনি। আব্বা বললেন পাকিস্তানীরা হারামীপনা করেছে, ঠিকমত সাহায্য দেয়নি, এমনকি মৃতদের ঠিকমত দাফনের ব্যবস্থাও করেনি।

সকলেই জানেন ভয়াবহ সেই ঘুর্ণিঝড়ের কারণে দক্ষিণ বাংলার কয়েকটি আসনে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন কয়েকমাস পরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার আগেই নির্বাচন নিয়ে মানুষ মেতে ওঠে। স্কুলের স্যারেদের মুখে, স্থানীয় বড়ভাইদের মুখে শুনতে পাই, যে করেই হোক আওয়ামী লীগকে জেতাতে হবে, পাকিস্তানীদের প্রতি আর বাঙালীদের আস্থা নেই। ওরা আমাদের ভালমন্দ নিয়ে ভাবে না। আমাদের পাট বিক্রি করে বিদেশী টাকা উপার্জন করে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতি ঘটাচ্ছে, আর আমাদের বিপদের দিনে তারা সাহায্য করছে না। ঘুর্নিঝড়ের অনেকদিন পরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে এসে ক্ষুধার্ত মানুষদেও দেখে বলেন, "ওরা ভাত পায় না তো বিরিয়ানী খায়না কেন?" একথার সত্যতা পেয়েছি অনেক পরে, হাফিজ উদ্দিনের লেখায়। তরুণ লেফটেনেন্ট হাফিজ উদ্দিন ছিলেন প্রেসিডেন্টের এডিসি বা ওই জাতীয় কোন পদে কর্মরত। সেদিনের তরুণ লেফটেনেন্ট হাফিজ উদ্দিন পরবর্তীতে মেজর হাফিজ, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের তুখোর ফুটবলার, বি এন পি'র এমপি, বর্তমানে মন্ত্রী। তখন শেখ মুজিব বলেছেন পাকিস্তান সরকারের অবহেলার কারণে বন্যায় এত মানুষ মারা গেছে। বন্যার পরেও তারা ঠিকমত সাহায্য করেনি বাঙালীদের। সুতরাং তাদের ভোট দেয়া যাবে না। কারো মুখে তখন জানতে পারিনি আমার নেতা মোজাফ্ফর কি বলেছেন (মনে মনে মোজাফ্ফর আমার নেতা হয়ে গেছেন কখন তা অবশ্য জানি না)।

নির্বাচনোত্তর পুর্ববাংলাঃ

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের খবর আব্বার মুখে পেয়েছিলাম যথা সময়ে। মুলতঃ তিনি মাকে সব কথা বলতেন, আমরা সব কটি ভাই-বোন তা শুনতাম। কম্যুনিস্ট করা আমার ভাইটি তখন বরিশাল শহরে লেখাপড়া করেন। সুতরাং তার কাছে কোন কথা জানার সুযোগ ছিল না। বিকেলে স্কুল মাঠে খেলতে গিয়ে বড়ভাইদের, স্কুলের শিক্ষকদের মাঠের মাঝে গোল হয়ে আলোচনা করতে দেখেছি। সেখানে আমাদের কোন স্থান সংগত কারনেই ছিল না।

তবে ক্রমে বুঝতে পারছিলাম অবস্থা ভাল নয়। রাতে বাবা-মা'র আলোচনা থেকে বুঝতাম প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে গদিতে বসাতে চাইছে না। সে সময়েই প্রথম ভুট্টোর নাম শুনি। নামটি নিয়ে আমরা হাসাহাসি করতাম। ভুট্টা পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রধান খাদ্য বলে জেনেছি, সুতরাং তাদের নেতার নাম ভুট্টা হবে সেটাইতো স্বাভাবিক। ওসময়টাতে আমরা বন্ধুদের ওপর রাগ করে একে অপরকে ভুট্টা বলে গালি দিতে শুরু করেছিলাম।

২৩ মার্চ স্কুলে আমরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গাইতাম দু'টি গান। একটি ছিল "পাক সার জমিন সাদ বাদ"। অন্যটি "পাকিস্তান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ; পুরব বাংলার শ্যামলিমায়, পঞ্চ নদীর তীরে......" আর মনে নেই। জানতাম প্রথমটি পাকিস্তানের এ্যানথেম, অন্যটি পুর্ব পাকিস্তানের এ্যানথেম।

আগের বছরের মত আগের রাতেই আমরা ভাই-বোনেরা ঘরে বসে গান দুটোর রিহার্সাল দিলাম। কেননা, যদি আমরা ভাল গাইতে পারি হেডস্যার আমাদের ডেকে নেবেন সবার সামনে, আমরা গাইবো, তারপর অন্যরা সবাই গলা মেলাবে। ঘুমাবার আগে, হয়তো ৮/৯ টা হবে রাত, ওটাই পলীতে গভীর রাত, আব্বা ঘরে এলেন, বললেন কাল কারো স্কুলে যাওয়া হবে না। কারণটা তিনি বলেন নি। মনটা খারাপ হয়ে গেল। মেঝ বোনটাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনিও কিছু জানেন না বললেন। মনের ভেতর গভীর একটা ক্ষোভ আর দুঃখ নিয়ে ঘুমাতে গেলাম।

২৩ মার্চ, ১৯৭১। আমরা ভাইবোন সকলেই জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলাম স্কুল মাঠের দিকে। আব্বার নির্দেশ, তাই স্কুলে যাওয়া হল না। অনেকেই প্রতিবারের মত সেখানে উপস্থিত। শুধু নেই আমরা। মাইকের ব্যবহার ছিল না। তাই বক্তাদের কোন কথা আমরা শুনতে পাইনি। পতাকা উড়লো সবুজ রঙের, সাথে কালো পতাকা। মেঝ আপাকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন ওটা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। আমাদের বহুদিনের পরিচিত চাঁদ-তারা খচিত পতাকা উড়লো না। সমাবেশ শেষে মিছিল বেরুলো। মিছিল দেখে আমার সবচেয়ে ছোট বোনটি, যে এখন সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক, চিৎকার করে বলে উঠলো "আমি লীগ, আমি লীগ"। ও আওয়ামী লীগ বলতে পারতো না।

বলতো "আমি লীগ"। মিছিল দেখলেই ও এটা বলতো। সে মিছিলের অনেক শোগানের একটি আমার আজো মনে দাগ কেটে আছে। "পাকিস্তানের মাথায় লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।" আরো ছিল, "তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা।" "জাগো জাগো, বাঙালী জাগো" তোমার ভাই আমার ভাই, মুজিব ভাই মুজিব ভাই"। এ নিয়ে আমার সেজো বোন তামাসা করে বলতো, শেখ মুজিবের ছেলে মেয়েরাও কি শোগানে মুজিব ভাই বলে?

মিছিলটি যখন আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলছে, আমি আর থাকতে পারিনি, কাউকে না বলে পেছনের দরজা দিয়ে লুকিয়ে বেরিয়ে যাই এবং মিছিলের পেছনে যোগ দেই। সে মুহূর্তে আমার বাবা ভীতি বলে কিছু ছিল না। সময়টা তখন সকাল ৭/৮টা হবে।

বেলা ১১টা নাগাদ মিছিল শেষ হয়। তখন নিজেকে আবিস্কার করি বাসা থেকে বহুদুরে। জায়গাটার নাম সম্ভবত আমড়াঝুড়ি। আমাদের গ্রাম থেকে তিনটি গ্রাম দুরে। মিছিল শেষে সবাই চলে যাচ্ছে যে যার গন্ত ব্যে। আমি রাস্তা চিনি না, কোন পথে বাড়ি যাব?

এমন সময় এগিয়ে এলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা। দুঃখিত তাঁর নামটি আজ আর স্মরণ করতে পারছি না, বললেন- "তুই এখানে কি করছিস? কখন এসেছিস?" মিছিলের শুরু থেকেই আছি শুনে জানতে চাইলেন আমার আব্বা জানেন কিনা । না সুচক জবাব দিতেই তিনি বললেন- "আজ তোর কপালে দুঃখ আছে, চল আমার সাথে"।

না, সেদিন আমার কপালে কোন দুঃখ নেমে আসেনি। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, মিছিলে আমার অংশ নেয়ায় আব্বা খুশিই হয়েছিলেন, সরকারী চাকুরী করতেন বলে প্রকাশ্যে আমাদের অংশ গ্রহণ করতে দিতে চাইতেন না।

মার্চের প্রথম দিককার ঘটনা। এলাকা জুড়ে বলাবলি হচ্ছিল, বঙ্গবন্ধু ৭ তারিখ রেসকোর্সে ভাষণ দেবেন। রেসকোর্সের মানে তখনো বুঝি না। তবে এটুকু জেনেছিলাম স্কুলের মাঠের চেয়ে অনেক বড়

খেলার মাঠ রয়েছে ঢাকাতে, ওটার নাম রেসকোর্স। কিসের রেস, কেন এমন নাম সেটা তখনো জানা হয়নি।

৭ তারিখ সকাল থেকেই স্কুল মাঠে বড় আকারের একটা রেডিও নিয়ে জটলা। চান্দা ব্যাটারী স্টকে রেখেছেন মানিক দোকান্দার। রেডিওটাও তার। দিনভর রেডিও চলল জোর আওয়াজে। শুনেছিলাম মাইকের ব্যবস্থা করা হবে। স্থানীয় বড়ভাই কামাল বা কালাম ঠিক মনে নেই, থানা সদরে গেছেন মাইক আনতে। দুপুর নাগাদ ফিরে এলেন খালি হাতে। অগত্যা বিকেল নাগাদ রেডিওর কাছে জনতার ভিড় হল প্রচুর। আমরা ছোটরা একটু দুরে। বড়দের কাছে যাবার মত সাহস ও প্রয়োজন কোনটাই নেই কিনা। সন্ধ্যা পার হয়ে গেল, বঙ্গাবন্ধুর ভাষণ রেডিওতে প্রচার হল না। মনে অনেক দুঃখ নিয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেল। এখানে উলেখ করা প্রয়োজন, ইতোমধ্যে আমার মেঝ বোনের কাছে জেনে গেছি, শেখ মুজিবকে বঙ্গাবন্ধু বলা হয়। তোফায়েল নামে এক ছাত্রনেতা তাকে বঙ্গাবন্ধু উপাধি দিয়েছেন। আরো শুনেছি তোফায়েল নাকি ভোলার লোক। ভাল লাগলো, আমার ছোট চাচা মান্নান ডাক্তার ভোলায় থাকেন। কেমন যেন তোফায়েলকে কাছের মানুষ মনে হতো তখন।

দু'দিনবাদে ছোট একটা স্যুটকেসের মত বাক্সে এলো বঙ্গাবন্ধুর ভাষণ। দেখতে গ্রামোফোন রেকর্ডের মত। অনেকের মধ্যে আমিও সেদিন শুনেছিলাম সেই ভাষণ, “এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”। “যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবলো করতে হবে”।

এর কয়েকদিনের মধ্যে বড় ভাইদের ট্রেনিং শুরু হয়ে গেল স্কুল মাঠে। কেউ হাফ প্যান্ট, কেউবা পাজামা, কেউবা লুঙ্গি কাছা দিয়ে (শুদ্ধ বাংলা আজো জানি না, “কাছা দেয়া” আশা করি পাঠক বুঝবেন) ট্রেনিং-এ নেমে গেল। করাচি থেকে ছুটিতে আশা এক মিলিটারী (তখনো জানিনা মিলিটারীতে কোন পদ আছে কি না, বা সেই মিলিটারীর কি পদমর্যাদা ছিল) তাদের ট্রেনিং দিতে শুরু করলেন। প্রতিদিন বিকেলে ট্রেনিং হত। প্রথমে বাশের লাঠি হাতে ট্রেনিং চলেছে। কয়েকদিনের মধ্যে কোথা হতে এলো কাঠের রাইফেল। বলা হল আসল রাইফেলের ওজন সারে সাত সের। ভাবতাম, এত ওজন, কেমনে হাতে নিয়ে ট্রেনিং দেয়? ট্রেনিং চলাকালে আমরা, সমবয়সীরা দুরে দাঁড়িয়ে তাদের অনুকরণ করতাম।
সবচেয়ে ভাল লাগতো ক্রোলিং। আমরাও চর্চা করতাম। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই শুনলাম মিলিটারীর এক ক্যাপ্টেন আসবেন, নাম তার শাহজাহান ওমর। যথাসময়ে তিনি এলেন, সাথে এলেন মেজর জলিল। ক্যাপ্টেন এর মানে বুঝি, তিনি লিডার; মেজরটা কি? মেজর বড় না ক্যাপ্টেন? ভাবনায় পড়লাম। ক্যাপ্টেনইতো বড় হবার কথা। বাস্তবে দেখলাম ক্যাপ্টেন ওমর মেজর জলিল কে স্যালুট দিচ্ছেন। মেঝ বোনটাকে জিজ্ঞেস করলাম, বলল মেজর বড়। আমার মনের সন্দেহ আর কাউকে জানাতে পারলাম না। দীর্ঘদিন আমি ঐ দোটানা মনোভাব নিয়ে কাটিয়েছি।

মেজর জলিল ও ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর যুবকদের ট্রেনিং দেখলেন, তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, তখন বোধকরি দুরে অবোধ শিশুদের তিনি দেখে থাকবেন। মহসিন স্যারকে পাঠিয়ে আমাদের ডেকে নিলেন। মহসিন স্যার ছিলেন আমাদের মডেল প্রাইমারীর মাস্টার। আজ আর স্পষ্ট মনে পড়ে না, মেজর জলিল বা ক্যাপ্টেন শাহজাহান কি বলেছিলেন আমাদের। তবে এটুঁকু মনে আছে, তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, এই তোরা লাফালাফি করিস ক্যান? সাহস করে একসাথে কয়েকজনে বলে ছিলাম, “বড় ভাইরা করে, তাই আমরাও করি।”

এরপরের ঘটনা এটা, আমাদেরও বড় ভাইদের কাছে থেকে ঠিক তাদের মত করে শিক্ষা দেয়া শুরু হল। সে সময়ে শিখেছিলাম প্যারেড- মার্ক টাইম, কুইক মার্চ, হল্ট, রাইট টার্ণ/ লেফট টার্ণ।

বেশ ভাল লাগতো। বিকেলে এমন ট্রেনিং নেয়াতে আব্বা মাকে বেশ করে বকাঝকা করলেন। তার সরকারী চাকরী, বিপদ হতে পারে। তাছাড়া আমার তেমন কোন বয়স হয়নি, তাই ট্রেনিং দিয়ে কি হবে। সমস্যা ছিল আমার সেঝ ভাইটিকে নিয়ে, সে তখন কৈশোর পেরিয়ে যুবক, বড়দের দলে তার ট্রেনিং। আব্বা তাকে পাঠিয়েদিলেন ঝালকাঠি, আমার বড় বোনের বাড়িতে। পরে শুনেছি সেখানে গিয়ে সে বেশী দিন ছিল না। হঠাৎ করেই গায়েব হয়ে গিয়েছিল। এবং পাক মিলিটারীর হাতে পাকরাও হয়ে গিয়েছিল স্বরূপকাঠির বিখ্যাত পেয়ারা বাগানে। তাদের কাজ ছিল পেয়ারা বাগান ধ্বংশ করা, যাতে করে মুক্তি বাহিনী সেখানে ঘাঁটি গাড়তে না পারে। পরবর্তীতে আরো জেনেছি সেখানেই সে যুক্ত হয়েছিল সিরাজ সিকদারের দলের সাথে। দীর্ঘদিন সে তাদের সাথে ছিল। ৭৪ সালে সিরাজ শিকদার নিহত হবার পর সে ঘরে ফিরেছিল।

৭ মার্চ এর পর থেকে আব্বা প্রতি রাতে আকাশবাণী কলকাতা শুনতেন। সে সময়ে পরিচিত হই দেব দুলাল বন্দোপাধ্যায়ের কণ্ঠের সাথে। এ সম্পর্ক বজায় ছিল পুরো যুদ্ধের সময়টা। দরাজ কণ্ঠে দেব দুলাল পরিবেশন করতেন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কথা। আরো পরে গোপনে, খুব নীচু ভল্যুমে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতাম সকলে। আব্বা যুদ্ধের ভয়াবহতার কারণে আমাদের নানার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়ার আগ পর্যন্ত নিয়মিত সে অনুষ্ঠান আমরা শুনেছি। সেখানেই পরিচিত হই চরমপত্রের সাথে। সকলের মত তখনো জানি না কে পাঠ করছেন সেটি। চরমপত্রের কথা ও পাঠকের উচ্চারণ খুব ভাল লাগতো। উলেখ্য চরমপত্রের গ্রন্থক ও পাঠক নিজ পরিচয় খোলাসা করেছিলেন তার শেষ চরমপত্রে, ১৯৭১ সালের ১৬ বা ১৭ ডিসেম্বর। তার আগে কোন শ্রোতাই তার নাম জানত না।

যুদ্ধ শুরুঃ

মার্চের ২৭ বা ২৮ তারিখ। আব্বা জানালেন স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। দু'দিন আগে শেখ মুজিবকে পাকিস্তানিরা এ্যরেস্ট করে কোথায় যেন নিয়ে গেছে, কেউ তা জানে না। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, মেজর জলিল কেন ঘোষণা করলো না কেন? এটা ভেবে আমার খারাপ লেগেছিল। মেজর জিয়াকে তো চিনি না। মেজর জলিল কে দেখেছি। তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলে বোধ হয় ভাল হত, এমনটা ভাবছিলাম আমি।

মে মাসের কোন এক সময় প্রথম স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শুনি আমরা। কখনো নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলেও স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শুনতে পেতাম না। পরে জেনেছি ভ্রাম্যমান বেতার কেন্দ্রটি নিরাপত্তার কারনে স্থান বদল করতো। শেষদিকে অবশ্য নিয়মিত শুনতে পেতাম সে অনুষ্ঠান। সেই বেতারেই জেনেছি স্বাধীন বাংলা বিপবী প্রবাসী সরকারের কথা। একদিন কি ভাবে যেন আব্বা একটি পত্রিকা যোগার করে আনেন। সেখানে বিপবী সরকারের সদস্যদের ছবি দেখতে পাই। প্রথম দর্শনেই তাজউদ্দিনকে আমার ভাল লাগে। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্ণেল ওসমানীকে আমরা মোছুয়া বলতাম। হালকা পাতলা গড়নের ওসমানীকে বাকীদের সাথে দেখতে আমার ভাল লাগতো না।

এ সময়ে আমাদের বাইরে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলো। আব্বা এক সময়ে জানালেন আমাদের মাঝে শত্রু আছে। অনেক পরে জেনেছি আমাদের প্রিয় মহসিন স্যারও নাকি রাজাকার দলে নাম লিখিয়েছেন। রাজাকার মানে পাক মিলিটারীর দোসর। শুনে আমার মনটা খারপ হয়ে গিয়েছিল।

যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই আব্বা আমাদের নানার বাড়ী পাঠিয়ে দেবার কথা ভাবছিলেন। সমস্যা হল সবাইকে জানিয়ে তিনি এটা করতে চাইছেন না। তাহলে হয়ত ওটাও রাষ্ট্রদ্রোহীতার পর্যায়ের কাজ হবে। এসময়ে মাকে দেখেছি আমার বড় দু'বোন কে নিয়ে চিন্তিত। রাজাকাররা নাকি বড় মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়। নিয়ে কি করে তা বোঝার বয়স তখনো হয়নি। অবশ্য বর্তমানের শিশুরা আমাদের থেকে অনেক বেশী বোঝে, যেটা আমরা বুঝতাম না।

অবশেষে জুনের মাঝামাঝি এক ভোর রাতে আমরা নিঃশব্দে নৌকাযোগে সেহাঙ্গাল ছাড়লাম। বড় নদী এড়িয়ে ছোট খাল গলিয়ে পুরো দিন কেরায়া নৌকায় কাটিয়ে বিকেল নাগাদ আমরা নানা বাড়ি পৌঁছালাম। পথে বার দুয়েক নৌকা থামাতে হয়েছিল। কোথায়ও বাবার নাম বলে, কোথায়ও মেঝো মামার নাম বলে চেকিং এর হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। নৌকার ভেতরে মাকে দেখেছি তছবিহ হাতে সময় কাটাতে। আলাহ সে যাত্রা আমাদের কোন বিপদ দেননি। নানা বাড়ি পৌঁছে মা অনেক্ষণ ধরে নামাজ পড়ে তবে খাবার খেয়েছিলেন।

যুদ্ধের বাকী সময়টা নানা বাড়িতে কাটিয়েছি। অক্টোবরের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে একদিন সকালে দেখলাম আব্বাও চলে এসেছেন। যুদ্ধের মধ্যে আর ফিরে যাননি কর্মস্থলে।

এ সময়টাতে কখনো গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখেছি আহত মুক্তিযোদ্ধাদের আব্বা চিকিৎসা করছেন। তিনি সরকারী চাকুরির পাশাপাশি হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করতেন। ১৯৪২ সালে তিনি কলকাতার বেঙ্গল মেডিক্যাল ইনসটিটিউট থেকে হোমিও ডিপোমা করেছিলেন, পরে জেনেছি। তিনি '৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশ এয়ারফোর্সে কাজ করেছেন। বেশীর ভাগ সময়ে দেখেছি দক্ষিণ বাংলার বিলাঞ্চলে খালি পায়ে হাটা মুক্তিযোদ্ধাদের পায়ের ক্ষতে ওষুধ লাগাতে। যাদের অভিজ্ঞতা নেই তারা বুঝতে পারবে না, পানিতে হাটা পায়ে কি ভীষণ ক্ষত হয়। এপ্রসঙ্গে আর বেশী আলোচনা করাটা বোধহয় সংগত হবে না। কারণ সেটা হয়ে যাবে নিজেদের কীর্তি ফলাও করে প্রচার করা, যেটা আমার আব্বা পছন্দ করতেন না।

আমার দুটি বড় ভাই এবং মেঝ মামা ছিলেন পাকিস্তানে যুদ্ধ বন্দী। বাকী দুটি ভাই মুক্তিযুদ্ধে। পুরো যুদ্ধের সময় তারা ঘরে ফেরেনি। একজন ছিলেন ন্যাপ, সিপিবি ও ছাত্র ইউনিয়ন যৌথ বাহিনীতে, অন্যজন সিরাজ সিকদারের সাথে। মা-নানীকে সারাক্ষণ দেখেছি তাদের চিন্তায় চিন্তিত। ছোট মামা তখন পিরোজপুর মহকুমা জেলে বন্দী। আব্বা বলতেন, জেলে আছে ভাল আছে। বাইরে থাকলে বিপদ হত। কারণ ছোট মামা ছিলেন খুব রগচটা স্বভাবের মানুষ। আজো তিনি তেমনি আছেন। যুদ্ধের শেষের দিকে আমি দেখেছি মুজিব বাহিনী ও মুক্তি বাহিনী মুখোমুখি, দেখেছি তাদের লড়াই। কারণটা বুঝতাম না। ভাবতাম দু'দলই যখন দেশের স্বাধীনতা চায়, নিজেরা কেন তবে যুদ্ধ করে?

যুদ্ধ শেষ হল। অনেকেই ঘরে ফিরছেন। আমার দু'ভাই তখনো ফেরেনি। মাকে, নানীকে দেখেছি লুকিয়ে কাঁদছেন। এরিমধ্যে শেখ মুজিব ছাড়া পেয়েছেন। দেশে আসছেন, বাংলাদেশ বেতারে নানান অনুষ্ঠান। মুজিব ভাইয়ের নামে নানান শোগান তখন বেতারে। এসময়ে আমার এক দুর সম্পর্কের মামী, যিনি সম্পূর্ণ অর্থে মূর্খ, লেখা পড়া জানেন না, এসে আমার আব্বাকে বললেন, "কিরে মাস্টার মজিবররে একলা একলা ছাড়াইয়া আনতাছেন, মোগো এটটু খবরও দিলা না?"

শেখ মুজিব ফিরে আসার অনেক পরে, মার্চ, ৭২ এর কোন এক সময়ে আমার দুই ভাই ঘরে ফিরে এলেন, আশ্চর্যজনক ভাবে একই দিনে। অথচ তারাও জানতেন না যে তারা একসাথে ফিরছেন। তাদের পেয়ে আনন্দের সাথে কান্নার জল আমার চোখ থেকেও গড়িয়ে পরেছিল।

এ সময়ে আমার এক দুর সম্পর্কের মামা মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হন। শুনেছিলাম তিনি নাকি রাজাকার ছিলেন। পরে জেনেছি ব্যক্তি স্বার্থে তাকে প্রতিপক্ষ খুন করেছিল।

যুদ্ধের সময় আব্বার কাছে শুনেছি, বেগম সুফিয়া কামাল পালিয়ে রাশিয়া গেছেন, রাশিয়া আমাদের সাহায্য করছে।

ভারতের ইন্দিরা গান্ধিও আমাদের সাহায্য করেছেন। তাজউদ্দিন এসময়ে আমার কাছে এক জীবন্ত কিংবদন্তি হয়ে ওঠে। দুর্ভাগ্য আমাদের স্বাধীন দেশে তাজউদ্দিনের সঠিক মুল্যায়ন হল না।

সম্ভবত একারণেই আমাদের স্বাধীনতা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ভীষন হোচট খায় এবং আজো এক প্রকার খুঁড়িয়ে চলছে আমাদের লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশটি।

(মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি লিখতে আরো লম্বা সময় দরকার। 'একাত্তর-বাঙালি জাতির জন্ম' নামক প্রকাশিতব্য গ্রন্থটির সম্পাদকের বেঁধে দেয়া সময়ে এর চেয়ে বেশী কিছু লিখতে পারলাম না। লেখা চলাকালে তাঁর ই-মেইল পেয়েছি বার বার তাগিদ দিয়ে। ধন্যবাদ দেওয়ান আবদুল বাসেত সাহেবকে, তাঁর তাগিদের কারণে এই প্রথমবারের মত মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কিছু লিখলাম।)

দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
৬ আগস্ট ২০০৪ইং

লেখক পরিচিতিঃ

কবি ও কলামিস্ট। সপরিবারে দুবাই প্রবাসী এ লেখক 'ভিন্নমত' ও **'সদালাপ'** এর মতো জনপ্রিয় বাংলা ওয়েবসাইটগুলোতে নিয়মিত লেখেন। কখনো সখনো **'মরুপলাশ'** এ ও লিখেন। এক সময়ে দৈনিক জনকন্ঠ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলার বাণী, দৈনিক সবুজ বাংলাসহ কয়েকটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন ও কলাম লিখতেন। বৃটেনে সাপ্তাহিক জনমত ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় বছর দুয়েক তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে।
৫ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ সালে (প্রকৃত জন্ম তারিখ ১২ নভেম্বর, ১৯৬২) পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠীতে জন্মগ্রহণকারী জনাব নুরুল্লাহ মাসুম বাংলা একাডেমীর জীবন সদস্য এবং বাংলা একাডেমীর লেখক অভিধানের তালিকাভুক্ত লেখক। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস এর একজন লিডার ট্রেণার।

প্রকাশিত গ্রন্থঃ
জেন এয়ার (অনুঃ উপন্যাস,১৯৯২); সুর্যোদয়ের দেশে (১৯৯৪); গোপাল হলেন রাজা (১৯৯৪); বর্ষণের গাঁথা মালা (গল্প, ১৯৯৪); সুমনের সমুদ্র যাত্রা (১৯৯৫); প্রেসিডেন্ট স্কাউট হতে হলে (১৯৯৫); ব্যাডেন পাওয়েল (যৌথ, ১৯৯৬); ছিনতাই (ছোটগল্প সংকলন,১৯৯৬); ভয়ঙ্কর ৭ গোয়েন্দা (১৯৯৭); একজন বঙ্গবন্ধু (জীবনী, ১৯৯৭); দক্ষিণের বাদশাহ খান জাহান আলী (জীবনী, ১৯৯৭)।

স্বাধীন দেশের নাগরিক ঃ দেশে ও প্রবাসে

ড. মনজুরুল ইসলাম

স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পরেও কতগুলো ধারণা আমাদের মধ্যে বদ্ধমুল হয়ে আছে যার বিকল্প চিন্তাভাবনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এসবের পূণর্বিবেচনা আবশ্যক। মুক্তিযোদ্ধা, দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার সপক্ষেক ব্যক্তি - এদের মধ্যে কি আমরা বড় রকমের পার্থক্য খুঁজবো। বিচার করতে বসবো কি কে বড় কে ছোট, কার গুরুত্ব বেশী, কার কম - এ নিয়ে?

সচরাচর অর্থে আমরা যা বুঝি তা হলো - একাত্তরের ২৬শে মার্চ থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুলতঃ রণাঙ্গনে শত্রুসেনার বিরুদ্ধে যারা লড়েছে তারাই মুক্তিযোদ্ধা। এছাড়া এই যোদ্ধাদের রণাঙ্গনে সাহায্য করার জন্য যারা বিভিন্নভাবে পিছন থেকে বা দেশের অভ্যন্তরে থেকে সরাসরি অংশ গ্রহণ করেছেন, তারাও এই পর্যায়ভুক্ত। আরেক অর্থে, বিদেশে বা প্রবাসে যারা দেশ থেকে গিয়ে বা ঐ সময়ে সেখানে বসবাস করে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বিভিন্নভাবে (যথা আর্থিক, প্রচারভিত্তিক, নৈতিক ইত্যাদি) অবদান রেখেছেন বা দেশের মুক্তির জন্য যে কোন রকম কাজ করেছেন, তারাও মুক্তিযোদ্ধা।

প্রায় নয়মাস সময়ই ছিলো মুক্তিযুদ্ধকাল। দেশপ্রেমিক অর্থ - আরো ব্যাপক। যে কোন সময় বর্তমান বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চলে বাস করে বা বিদেশেও অবস্থান করে মাতৃভুমির মঙ্গালের জন্য যারা চিন্ত াভাবনা করেন এবং দেশের দুর্যোগ মুহূর্তেও নিজেদেরকে লুকিয়ে না রেখে যে কোন রকম উন্নয়নের জন্য অবদান রাখেন, দেশবাসী এবং দেশের জন্য ভালোমন্দ বিবেচনা করে আন্তরিকতার সাথে অন্যদেরকেও দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করেন, তারা সবাই দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেমিক স্বদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং উন্নতিতে গভীর আস্থা স্থাপন করেন- যে কোন মুল্যে এগুলো রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন। দেশে যত করুণ অবস্থাই বিরাজ করুক না কেন, সত্যিকারের দেশপ্রেমিক মাতৃভুমির জন্য গর্ববোধ করেন, সার্বভৌমত্বে তৃপ্তিবোধ করেন। দেশের ভুলত্রুটি সমাধানের চেষ্টায় নিয়োজিত থেকে দেশের পজিটিভ দিকে দৃষ্টিদান করে নিগেটিভ বিষয় সমুহে হতাশাগ্রস্থ না হয়ে দুরীকরণের ভুমিকায় অবতীর্ণ হন বা যাদের অধিকতর যোগ্যতা বা সামর্থ্য আছে তাদের পদক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করান। এই দেশপ্রেমিক যে কোন কালে যে কোন স্থানে হতে পারেন।

স্বাধীনতার সপক্ষের ব্যক্তি যে কেউ হতে পারেন না, স্বাধীন দেশটিতে বাস করলেও না। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বা তার বহু পূর্বে - যখন থেকে এই অঞ্চলের লোকের মধ্যে আপন সত্ত্বা ও মর্যাদা নিয়ে স্বাধীনভাবে বসবাস করবার প্রতিজ্ঞা জন্মায়, এবং বর্তমান পর্যন্ত (যখন কেউ কেউ এর স্থায়িত্বে এখনো সন্দিহান) যাদের চিন্তাধারায় প্রভুত উন্নত জীবনের আশ্বাসেও অন্যের অধীনে দেশকে দেখার আগ্রহ নেই, যারা দেশটিকে যে কোন মুল্যে স্বাধীন রাখার জন্য বদ্ধপরিকর, তারাই স্বাধীনতার সপক্ষের মানুষ।

যারা দেশের স্বাধীনতা বিরোধী ও শত্রুদের সাথে আপোস করতে চান, যারা মানসপটে এখনো ধারণ করে রেখেছেন যে, স্বাধীনতার আগেই দেশটি ছিলো ভালো, এবং যারা স্বাধীন না থেকে পুর্বের শত্রুদেশ বা বর্তমানের কোন মিত্র দেশের সাথে হাত মিলিয়ে নিজেদের সার্বভৌমত্বকে বিকিয়ে দিতে চান - তারা সবাই স্বাধীনতা বিরোধী।

এদেরকে যারা প্রতিহত করেন, যারা অনাদিকালের দেশপ্রেমিক, যারা বহুকাল থেকে লালিত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সম্মান করেন অথবা যারা স্বাধীনতার মূল যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা, তারা সবাই স্বাধীনতার সপক্ষের ব্যক্তি।

দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার সপক্ষের ব্যক্তি ও মুক্তিযোদ্ধা এই তিন ধরনের বাংলাদেশীর ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এই ত্রয়শক্তির সম্মিলিত এবং সমন্বিত অবদান দেশকে রাজনৈতিকভাবে করতে পারে আরো প্রত্যয়ী। স্বাধীনতাবিরোধী চক্র এবং শত্রুশক্তির সবরকম ষড়যন্ত্র ও কুপ্রচেষ্টা বাংলাদেশের সোনালী মাটি থেকে যতশিঘ্র মুক্ত করা যাবে ততই সম্ভাবনা থাকবে সোনার বাংলা বাস্তবায়নের। নতুন প্রজন্মের ভূমিকা ও গুরুত্ব থাকবে এর রূপদানে। এরা তাদের পূর্বসূরীদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে সার্বভৌমত্বের সাথে ধরে রাখবে এবং একে করবে আরো উন্নত।

বর্তমানে আটচলিশ বছর বয়সের কম যারা তারা তো মুক্তিযোদ্ধা হতে পারেন না। কিন্তু তারা হতে পারেন তাদের অগ্রজদের আদর্শে অনুপ্রাণিত। বীর মুক্তিযোদ্ধা দাবী করার জন্য দরকার নেই আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের। তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেও যেটি পারে তা হচ্ছে দেশপ্রেমিক হিসাবে এবং স্বাধীনতার সপক্ষের বাংলাদেশী হিসাবে সবসময় টিকে থাকতে। নতুন প্রজন্মকে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যায় না। মুক্তিযোদ্ধারা যেমন শত্রুদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন জানমালের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে, তেমনি বর্তমান প্রজন্মের বাংলাদেশীরা পারবে নিজেদেরকে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলে দেশগড়ার কাজে দায়িত্ব পালন করতে এবং দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মনোভাবাপন্ন দেশবাসীকে সংশোধন করাতে, চাপ সৃষ্টি করতে।

যারা ছাত্র, তারা দলীয় রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে সত্যিকারের লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করবে - শেখার জন্য, জানার জন্য; শুধু ডিগ্রির জন্য নয় বা শুধু চাকুরির জন্য নয়। যারা শ্রমিক তারা আরো দক্ষতা অর্জন করবে এবং নিজস্ব দায়িত্ব নিষ্ঠা ও সততার সাথে পালন করবে; যারা কৃষিজীবি তারা আধুনিক পদ্ধতি রফত করে উন্নয়ন করবে তাদের কৃষি সম্পদকে; যারা চাকুরে তারা চেষ্টা করবে সততার সাথে সেবার মানস নিয়ে কাজ করতে - শুধু বেশী করে মনে রাখতে হবে তারা এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের কর্মচারী, কর্মকর্তা; তারা মালিক বা প্রভুপক্ষ বলতে কিছু নয়; তারা সত্যি সত্যি 'ফ্রেন্ডস, নট মাস্টার্স'; যারা ব্যবসায়ী বা পেশাজীবি তারাও নিজ নিজ ব্যবসা বা পেশায় দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান তৈরী করবে ও সেবামুলক মনোভাব পোষণ করবে।

ঔপনিবেশিক শাসনামলের বৃটিশ আমলাদের মতো বসকে বা উর্ধতন কর্মকর্তাকে 'স্যার' সম্বোধন করার বা মালিক ভাববার কোন যুক্তি নেই, তেমন পত্রশেষে বা দরখাস্ত শেষে 'আপনার বিশ্বস্থ বা অতি বিশ্বস্থ সার্ভেন্ট বা সেবক', এর বদলে বর্তমানে স্বাধীন দেশে তা হওয়া দরকার- 'আপনার আন্তরিক সহকর্মী বা 'আপনার সহযোগী বা'সহকর্মী' বা 'গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের সেবায়'...... ইত্যাদি। আবেদনকারী কোন ব্যক্তি বা পাবলিকের দরখাস্থের প্রত্যুত্তরে সম্বোধন শেষে সরকারি কর্মচারী বা কর্মকর্তার লেখা উচিত, 'আপনার /আপনাদের আন্তরিক সেবায়.......' ইত্যাদি। প্রতিটি পত্রে এইটুকু পুণর্বার লেখা থেকে স্বাভাবতই যে উপলব্দি হবে, তা সরকারি কর্মকর্তার সেবার মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

প্রত্যেকেরই প্রতিজ্ঞা হতে হবে সৎপথে অবস্থান করে নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে যার যার কাজ করা; দলমত নির্বিশেষে কতগুলো জাতীয় বিষয়ে ঐকমত্য বজায় রাখা এবং স্থায়ীভাবে সমাধান বের করা - সরকারের পরিবর্তনের সাথে সাথে যাতে সব কিছু দুর্বল হয়ে না পড়ে।

গণতন্ত্রে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নির্বাচিত সরকার আসবে এবং যাবে। তাতে পরীক্ষিত ও পদ্ধতিগত বিষয়ে বা শুদ্ধ সিসটেম্‌স-এর কোন পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন নেই।

স্থায়িত্বের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি নিরপেক্ষ উপদেষ্টা পরিষদ থাকা বাঞ্ছনীয় যার কাজ হবে স্বাধীনভাবে, সকল পক্ষের প্রভাবমুক্ত হয়ে দীর্ঘমেয়াদী কিছু পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এগুলোর বাস্তবায়ন সরকার বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহই করবে, কিন্তু সেগুলোর টেকনিক্যাল মনিটরিং বা খোঁজখবর রক্ষা করবে উক্ত উপদেষ্টা পরিষদ। সার্বিক আলোচনা করবে, প্রথমে জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি এবং পরে পূর্ণ সংসদ। এই উপদেষ্টা পরিষদ সরকারি কর্মকর্তা বা ব্যুরোক্র্যাটদের একক গুরূত্ব কমিয়ে বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিত্বশীল সদস্য, নাগরিক এবং কিছু বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত হবে। এই পরিষদ রাষ্ট্রের স্থায়ী বিষয়গুলো নিয়ে পরিকল্পনা রচনা করবে। প্রতি সরকার এগুলো পরিবর্তন না করে বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকবে। সাথে সাথে সংশিষ্ট নির্বাচিত সরকারের নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ প্রগ্রামগুলোও বাস্ত বায়িত হবে।

উদাহরণস্বরূপ, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়ে জাতীয়ভাবে হরতাল পালন করা যাবে কিনা; পালিত হলেও, তার নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া যায় কিনা; দেশের সংকটময় মুহূর্তে বা জরুরী অবস্থায় পার্লামেন্টে সচরাচর ৯০ দিনেরও কম উপর্যুপরি কম কতদিন অনুপস্থিত থাকলে বা অংশগ্রহণ না থাকলে, সাংসদদের সদস্যপদ বাতিল হবে বা তাদের সুযোগ সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত করা হবে; ছাত্রেরা সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে কিনা; বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণে আমাদের দেশের পক্ষ থেকে দেশের স্বার্থে কিছু পুর্বশর্ত আরোপ করা যায় কিনা- ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক সরকারের আওতামুক্ত জাতীয় মতামত নির্ণয় করা যায় উপরোক্ত পর্ষদের মাধ্যমে। অনতিবিলম্বে একজন ন্যায়পাল নিয়োগ করে সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যবিধি পর্যবেক্ষণে রাখা যায় কিনা, সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেয়া আবশ্যক।

বৈদেশিক সম্পর্ক স্থিতিশীল ও প্রাগাঢ় করার উদ্দেশে আমাদের কূটনীতিকদের একটি সদ্য স্বাধীন উন্নয়নগামী রাষ্ট্রের নিবেদিত প্রতিনিধি হিসাবে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। যথা- একজন সিনিয়র কূটনীতিককে তিরিশ বছরের প্রবাস জীবনের মধ্যে অন্ততঃ দু'টি ভাষাভিত্তিক অঞ্চলে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে চাইলে দেশে বসেই অন্ততঃ একবছরে বিশেষ কোর্স করে আরবী ভাষায় কাজ চালাবার মতো ভাষাজ্ঞানের দক্ষতা অর্জন করা কাম্য। ইংরেজি ছাড়াও এরকম মুল বিদেশী ভাষার (আরবি, রাশিয়ান, জার্মান, ফরাসী, স্পেনিশ, চাইনিজ, জাপানি) যে কোন একটি বা দু'টি জানা থাকলে কূটনৈতিক কাজের সহায়তা হয়। বহু দেশের কূটনীতিকেরা এই পারদর্শিতা অর্জন করে ঐসব দেশে পোস্টিং নেন। ভাষাজ্ঞান একটি অত্যাবশ্যকীয় সম্বল। এছাড়া, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কর্মস্থলের দেশটি থেকে সংশিষ্ট কূটনীতিকের কী কী বিশেষ ভূমিকার ফলে অর্থবহ অবদান বাস্তবায়িত হয়েছে, তা পুংখানুপুংখরূপে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

দেশের ভিতরে সিভিল সার্ভিস বা প্রফেশনাল চাকুরিগুলোর সদস্যদের প্রতিজ্ঞাবব্ধ হতে হবে যেন ঘুষ না খাওয়া হয়, অযথা ও অন্যায়ভাবে যেন জনগনের কাজ বা সমস্যা সমাধানের বিলম্ব না করা হয় এবং যেন একই কাজের জন্য বহু টেবিলে ঘুরাঘুরি বা বিভিন্ন অফিসে দৌড়াদৌড়ি করতে না হয়। বাঁধা নয়, সাহায্য করার মনোবৃত্তি তৈরী করতে হবে, প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে।

নিজ নিজ কাজের জন্য কোন ব্যক্তিকে সরকারি অফিসে যাতায়াত করতে হলেও সরকারি কর্মকর্তাকে স্মরণ রাখতে হবে, দেশবাসীর সম্মিলিত কাজ থেকেই হয় দেশে উন্নয়ন। একটি গৃহ নির্মাণ করলে বা ক্ষুদ্র শিল্প

স্থাপন করতে চাইলে বা কোন ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে চাইলে বা কৃষিকাজে ঋণ গ্রহণ করলে, তা সার্বিকভাবে দেশের উন্নয়ন কাজেই অবদান রাখবে।

ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যোন্নয়ন থেকেই তো হবে জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন- ক্ষুদ্র থেকেই বৃহৎ; মাইক্রোর পরেই ম্যাক্রো। একটি স্বাধীন দেশের আমলা বা সরকারি কর্মকর্তাদের তাই মুল্যায়ন হবে এইভাবে যে, কে জনগনের কতজনকে কতটুকু সাহায্য করতে পেরেছেন, কাজটি সমাধা করতে কত ত্বরান্বিত করতে পেরেছেন। স্বাধীন রাষ্ট্রে এখন আর বাঁধা সৃষ্টি করা নয়, বরঞ্চ সমস্যার শীঘ্র সমাধান করাতেই হবে কর্মকর্তার কৃতিত্ব, তার ব্যক্তিগত পদোন্নতির মাপকাঠি। তিনি কত অধিকসংখ্যক ব্যক্তির বিষয় কত শিঘ্র ও সুষ্ঠুভাবে সুরাহা করতে পেরেছেন তার উপরই পর্যালোচনা হবে তার কর্মদক্ষতার। এছাড়া, কত সম্মানসুচক ও বন্ধুসুলভ আচরণ তিনি তার কাছে আসা ব্যক্তিকে প্রদর্শন করতে পারলেন, তাও হবে বিচার্য। তবেই সার্থক হবে স্বাধীন দেশের আমলাতন্ত্র। অন্যথায় এটা হবে বোঝা, আমলারা হবে গণবিমুখ ‘মাস্টারর্স’, বন্ধু নয়। হবেন গণতন্ত্রের অন্তরায়; আরেক অর্থে স্বাধীনতারও।

একটি স্বাধীন দেশে কার্যপদ্ধতি হতে হবে ১৯৪৭ পুর্ব পরাধীন এবং ১৯৭১ পুর্ব স্বাধীন-হয়েও-পরাধীন দেশের সিস্টেমগুলোর চেয়ে অনেকক্ষেত্রে ভিন্ন। আমলাদের ভাবতে হবে জনগনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে পারাতে তাদের যোগ্যতা প্রমাণিত হবে। তারা জনগনকে সরকারি কাজের রীতিনীতির ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত ও সহজ পদ্ধতিতে সহায়ক হিসাবে নির্দেশ প্রদান করবেন। জনগনের দায়িত্ব হবে সরকারি কর্মকর্তাদের কোন উৎকোচ গ্রহণে উৎসাহিত না করা; অনিয়মিতভাবে কোন কাজ সমাধা করতে না চাওয়া ও আপন আপন দায়িত্ব নিয়ম মাফিক পালন করা- যথারীতি খাজনা দেওয়া, আয়কর পরিশোধ করা, বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানি-টেলিফোন ইত্যাদি বিলগুলো সময়মতো পরিশোধ করা, পৌরকর প্রদান ইত্যাদি।

নাগরিকের পক্ষ থেকে এসব সরকারি দেয় সময়মতো এবং ঠিকমতো পরিশোধ হলে, সংশিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ‘উপরি’ আশা করার ‘স্কোপ’ থাকবে না। ব্যাংক, গৃহঋণ সংস্থা এবং অন্যান্য অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ অনুমোদন করতে হলে এবং তা যথাসময়ে কিস্তিতে পরিশোধ করতে হলেও একটি নিয়মের মাধ্যমে চলতে হবে। অনুমোদনের জন্য নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করার সময়টি হাতে রাখতে হবে। অহেতুক তড়িঘরি করে, কর্মকর্তার ‘অতিরিক্ত সার্ভিস’ এর সুযোগ না করে দিলে কর্মকর্তা স্বয়ং অনিয়মে বেশী দুর অগ্রসর হতে পারবেন না। যেখানে সম্ভব অটোমেশন বা কম্পিউটার পদ্ধতি চালু করতে হবে; ব্যক্তিবিশেষের সরাসরি হস্তক্ষেপ যত কম হবে কাজ তত দ্রুত এবং দক্ষ হবে; মেনিপুলেশন কমে যাবে। যে কোন তদবির এর ‘স্কোপ’ কমাতে হবে। তদবির এর প্রাচুর্যহেতু তদবিরে তদবিরে প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং এর ফলাফল হয় অশুভ।

ছাত্রছাত্রীর ভর্তি এবং বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয় ও ঘোষণায় যে বিশাল অনিয়ম রয়েছে তা দুর করতে হবে। একটি উত্তম পদক্ষেপ ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে- উন্নত দেশগুলোর মতো গ্রেডিং সিস্টেম চালু (বিভাগ এবং নম্বরের পরিবর্তে) এবং মেধানুসারে স্থান নির্ণয় বাতিল। আরো পদক্ষেপ প্রয়োজন । এমনি বিভিন্ন স্তরে- শিক্ষাজীবনে, কর্মজীবনে, প্রশাসনে, রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশ গ্রহণে-আমাদের রীতিনীতি বা সিস্টেম এবং অভ্যাস বা চর্চা বা প্রাকটিসের আমুল পরিবর্তন দরকার। রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের দেশকে এখন আর ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’র আখ্যা দেয়া হয় না বটে; আমরা অনুন্নত থেকে উন্নয়নশীল পর্যায়ে উন্নীত হয়েছি ঠিকই, কিন্তু সত্যিকার অর্থে, আমরা যে একটি সম্ভাবনাময় দেশের অধিকারী তার কতটুকু প্রমাণ দিতে পারছি আমাদের কাজেকর্মে? আমরা যারা প্রবাসে আছি, বিশেষ করে যেসব দেশে ঘুষ, উৎকোচ, মিথ্যাচার তেমন নেই, যেসব দেশে আমাদের আয়কে সম্পুর্ণ ‘হালাল’ বিবেচনা করা হয়, যেসব দেশে আমাদের অনেকের বহুকাল কেটে গিয়েছে, তারা কি পারিনা,এসব

দেশের কর্ম অভিজ্ঞতা, পরিবেশ ও উন্নত প্রযুক্তি বা টেকনোলোজির লব্দ জ্ঞান থেকে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে?

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আসুন আমরা এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করি। আমরা কেউ দেশে ছুটি কাটাতে যাবার সময় বা একেবারে ফিরে যাবার সময় যেসব মালামাল নিয়ে যাই- তার একসেস্ ব্যাগেজ চার্জ বা অতিরিক্ত ওজন বহনের খরচ, শুল্ক বা অন্যান্য চার্জ যেন যথাযথভাবে প্রদান করি ব্যাংক বা নির্ধারিত সিদ্ধ পথে। আমরা কেউ যেন কাউকে উৎকোচ না দেই-প্রয়োজনে কয়েক ঘন্টা বিলম্ব করবো এয়ারপোর্টে, অথবা পরে আরো দু'একদিন দৌড়াদৌড়ি করবো, তারপর মালামাল খারিজ করবো। সামর্থ্যে না কুলালে অতিরিক্ত ওজনের বা অধিক শুল্ক ও কর ধার্য হয় এমন জিনিষ তেমন নিবো না সাথে।

এমনি আরো বহু পদক্ষেপ নিতে যদি আমরা দৃঢ়প্রতীজ্ঞ হই, 'সাহসী' হই, অনেক অনিয়ম ও অনাচার আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। সাধারণ নাগরিকেরা ও প্রবাসীরা দেশ সম্বন্ধে হতাশাব্যাঞ্জক ধারণা পোষণের পরিবর্তে ধীরে ধীরে একটি সুখকর ও পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে সমৃদ্ধ স্বাধীন মাতৃভূমি গঠনে যার যার ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবো।

[সউদী আরবের একমাত্র নিয়মিত বাঙলা সাহিত্য দ্বিমাসিক **'মরুপলাশ'** জুন, ২০০১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'দেশগঠনে প্রবাসীর কিছু দায়-দায়িত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধের ঈষৎ পরিবর্তন / পরিবর্ধন।]

লেখক পরিচিতিঃ

ড. মনজুরুল ইসলাম আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন প্রকাশনা বিশেষজ্ঞ। বর্তমানে তিনি রিয়াদ কিং সউদ ইউনিভারসিটি'র একাডেমিক পাবলিশিং বিভাগের ফ্যাকাল্টি মেম্বার (অধ্যাপক) এবং সিনিয়র এডিটর হিসেবে কর্মরত আছেন। আন্তর্জাতিকভাবে বহু কনফারেন্সে যোগদানকারী ড. মনজুর বিবিধ পত্র-পত্রিকা এবং জার্নাল গবেষণাধর্মী লেখা প্রকাশের একজন জ্ঞানতাপস ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের আধুনিকীকরণ বিশেষ করে সত্তর ও আশির দশকে তার অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম, এ সহ জার্নালিজমে ডিপোমা এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশনা বিজ্ঞানে ডক্টরেট অর্জনকারী ড. মনজুর বেশ কিছুকাল যুক্তরাজ্য (অক্সফোর্ড) এবং কানাডায় পাবলিশিং কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। প্রকাশনা-গবেষণা-অধ্যাপনা পেশার পুর্বে তিনি কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসের সদস্য হিসেবে সরকারী চাকুরি করেন।

একাত্তর বাঙালি জাতির জন্ম

দেওয়ান আবদুল বাসেত

আমাকে ক্ষমা করো দিপালী। তোমার ধর্ষিত হবার আমি নীরব সাক্ষী হয়েও গত ৩৩ টি বছরেও তোমাকে নিয়ে কিছু লিখিনি। তোমার ইতিহাস, তোমার বঞ্চনা, তোমার ত্যাগ, তোমার দ্রোহ, তোমার আকুতি এবং না পাওয়ার বেদনা সবই আমার কলমে এতোদিন বন্দী ছিলো। জানি এতোদিন পর এই জীবন কাসুন্দি তোমার কোন উপকারেই আসবে না। তবু দেরীতে হলেও আমি তা দেশবাসীকে, আমাদের একাত্তর পরবর্তী প্রজন্মকে জানাতে পারছি বলে আমার ঋণের বোঝা, আমার অপরাধবোধ কিছুটা হলেও হালকা হবে। এর সঙ্গে দেশের জন্যে আর এক বীর-বীরাঙ্গনা এক টগবগে তরুণী এবং একজন অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা, আমার সহকর্মী শহীদ জোবেদার স্মৃতি রোমন্থন করে নিজকে একটু ভারমুক্ত করবো বলেই আজ কলম হাতে তুলে নিলাম। কথাগুলো গল্প বলার ঢং এর মতো মনে হতে পারে পাঠকদের কাছে। অথচ উহাই ছিলো আমার সেই কিশোর বয়সের মাছরাঙ্গা কিংবা ঈগল চক্ষু দু'টির প্রত্যক্ষ সাক্ষী। একাত্তরের উন্মাতাল দিনগুলোতে ঘটে যাওয়া এ মাত্র দু'টি ঘটনা। যা আমাকে এখনও প্রতিদিন প্রতিক্ষণে শিহরিত করে। প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দেয়। ব্যথিত করে। অশ্রুসিক্ত করে। আবার জাগিয়ে তুলে। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ এভাবে মরে মরে বেঁচে থাকার চেয়ে দেশ ও জাতির জন্যে কিছু একটা করে একবারেই মরতে আমাকে মন্ত্র দান করে।

তখন কীইবা এমন বয়স। অষ্টম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে সবেমাত্র ক্লাশ করতে শুরু করেছি। বঙ্গবন্ধুর ডাকে তখন চলছে সারাদেশে (পূর্ব পাকিস্তানে) অসহযোগ আন্দোলন। মনে হয়েছে যেন তখন বঙ্গবন্ধুই দেশের সরকার প্রধান। তাঁর কথা মতোই মানে তাঁর আদেশেই চলছে দেশ। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক এবং শিল্প-কারখানা। এক কথায় সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাঁরই কথায়। চাঁদপুর জেলা শহরের পূর্ব পার্শ্বেই ক্ষীণস্রোতা নদী ডাকাতিয়ার উত্তর পাড়ে দক্ষিণ তরপুরচন্ডী নামক ছোট্ট সবুজ গ্রামে আমার জন্ম। ছোট্ট জেলা শহরটির (তখন ছিলো মহকুমা শহর) ঠিক মাঝখানেই অবস্থিত আমাদের উচ্চ বিদ্যালয় (গনি মডেল মাল্টিলেটারেল হাই স্কুল।) পায়ে হেটেই স্কুলে যেতাম।

তখনকার চাঁদপুর কলেজ যা বর্তমানে চাঁদপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এর অগ্রজ ছাত্রগন এসে আমাদের ক্লাশ থেকে টেনে বের করে নিয়ে যেত মিছিলে যোগ দেবার জন্যে। তখনকার কলেজ ছাত্রদের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাদের দু'জনের কথা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে তাঁরা হলেন-জনাব হানিফ পাটওয়ারী এবং ফরিদগঞ্জের কালু পাটওয়ারী (দুঃখিত কালু পাটওয়ারীর প্রকৃত নামটি মনে করতে পারছিনা। তবে এনামেই তিনি তখন চাঁদপুরে খুবই পরিচিত ছিলেন।) হানিফ পাটওয়ারী (আমাদের স্কুলের উত্তর পার্শ্বেই যাদের বাড়ি) মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন একটি গ্রুপের কমান্ডার হয়ে বীরত্বের সঙ্গে পুরো নয়টি মাস মুক্তিযুদ্ধে তাঁর দলকে পরিচালনা করেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী।

তখন চাঁদপুরে চলছিলো অতিগোপনে স্বাধীনতার জন্যে প্রস্তুতি। তখনকার চাঁদপুর কলেজের অধ্যাপক সৈয়দ আবদুস সাত্তার এবং অধ্যাপক আবদুল মান্নান ছিলেন এর পুরো তত্ত্বাবধানে। চারজন টগবগে তরুণ ছাত্র সুশীল, শংকর, আবদুল খালেক ও আবুল কালাম ভুইঁয়া বোমা তৈরী করছিলো। মুহূর্তের জন্যে ওরা

কিছুটা অসাবধান হয়ে পড়লে, ওদের তৈরী একটি বোমাই বিস্ফোরিত হয়। যাতে চার তরুণই ঘটনাস্থলে মারা যায়। সেই চারজন টগবগে তরুণ ছাত্রই ছিলো চাঁদপুর জেলার স্বাধীনতা প্রস্তুতি পর্বের প্রথম শহীদ।

সে কথা আমার "*মোহনার ইতিকথা*" নামক একটি নাতিদীর্ঘ কবিতায় বলেছি প্রায় দেড় দশক পূর্বে। যে কবিতাটি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের পর আমার "*ভালাগে না*" নামক কিশোর কাব্যগ্রন্থেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অথচ ইতিহাস তাঁদের মনে রাখার প্রয়োজনও মনে করে না। কথাগুলো বড়ই আক্ষেপের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন সাংবাদিক চুন্নু ভাই। ১৯৯৯ সালের বার্ষিক ছুটিতে স্বদেশে থাকাকালীন চাঁদপুরের সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে কথা হচ্ছিল হাজিগঞ্জের সাংবাদিক ও ছাত্রনেতা মাহবুব আলম চুন্নু এবং অংকুর শিশু বিদ্যালয় এর প্রিন্সিপাল বন্ধুবর আলাউদ্দিন আহমেদ এর সাথে.....।

ঠিক সে সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত আমার বড় ভাই পাকিস্তানের মারী হিল্‌স ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছুটিতে দেশে এলেন। আর এসেই আটকে গেলেন। বলা যায় বিবেকের কাছে আটকে গেলেন। যদিও একবার তিনি প্রস্তুতি নিয়েছিলেন পাকিস্তান ফিরে যাবার জন্যে। ঠিক এমনি সময়ে লাহোরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত আমার এক মামার একটি ম্যাসেজ বহন করে আনে তখনকার ডাকবিভাগের পোস্টকার্ড। '*না ফিরে নিজ দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকো*'। আর তাতেই তিনি পাকিস্তানে ফেরা থেকে বিরত থাকলেন। নিজ দায়িত্ববোধ থেকেই তিনি চাঁদপুরের লন্ডন ঘাটের পেছনে বালুর মাঠে একটি গাদা রাইফেল দিয়ে (যা চাঁদপুর থানা থেকে তিনি পেয়েছিলেন) বেশকিছু ছাত্র ও বিভিন্ন পেশাজীবিদের ট্রেনিং দিতে শুরু করলেন। সেখানে আমিও কিছুদিন ট্রেনিং নিলাম। তখন জানতাম যে এ ট্রেনিং দিয়ে এবং ঐ রকমের একটি গাদা রাইফেল হলেই যুদ্ধ করা যাবে। দেশকে স্বাধীন করা যাবে। পরে বোঝেছি তাতে যৎসামান্য আত্মরক্ষা করা ছাড়া যুদ্ধ করা যায় না।

একদিকে মিছিল। অন্যদিকে ট্রেনিং। এমনি মিছিলে-ট্রেনিংএ মুখরিত চাঁদপুর তথা পুরো দেশটা হঠাৎ করেই মৌন-মুক হয়ে গেল। ২৫শে মার্চের কালো রাতে বর্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঝাপিয়ে পড়লো নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর। গনহত্যার মহোৎসবে তারা মেতে উঠলো। শহর ছেড়ে লাখো লাখো মানুষের স্রোত তখন গ্রামের দিকে। নৌ-সড়ক-আকাশ পথ সবই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। যানবাহন বলতে কিছুই ছিলো না। সেই কিশোর বয়সে মানুষের দুর্ভোগ দেখে কতবার যে কেঁদেছিলাম তা একমাত্র আলাহ্‌ই ভালো জানে।

একদিন বিকেল তিনটা হবে হয়তো। বাড়ির পাশ দিয়ে হাজার হাজার শহুরে লোকজন পায়ে হেটে যাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। আমাদের বাড়ির দক্ষিন পাশে একটি তালগাছের কাছে এসে এক গর্ভবতী মহিলা হঠাৎ করে ঘুরে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর শোনা গেল চীৎকার। আমি দৌঁড়ে গেলাম। দেখলাম একজন লোক সম্ভবত: মহিলার স্বামী। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তিনি কি করবেন। কোথায় যাবেন। কান্না জড়িত কন্ঠে দিশেহারা। মাত্র দশ-বারো হাত দুর দিয়ে হাজার হাজার নারি-পুরুষ- শিশুরা হেটে যাচ্ছে। অথচ কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। সেই কঠিন সময়টাতে কারো প্রতি কারো ফিরে তাকাবার সময়ও ছিলো না। সে সময়ে সবাই নিজকে নিয়ে ব্যস্ত। চাচা আপন বাঁচার সময়। সবাই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে নিজের জানটি নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে।

আমি ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরে দৌঁড়ে এসে আমার বোনকে বললাম। সে আরও কয়েকজন মহিলা নিয়ে ছুটে গেলো সেই পড়ে যাওয়া গর্ভবতী মহিলার কাছে। সেখানে আমার আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই দুর থেকে দেখলাম আমাদের বাড়ির মহিলারা তিন চারজন তাদের শাড়ির আঁচল খুলে সেই মহিলাকে ঘিরে ধরেছে। বাকি দু'জন সেই মহিলার পাশ ঘেষে বসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই মহিলার

একটি ফুটফুটে বাচ্চা হয়েছে। তারপর আমি আমাদের আশে পাশের আরও কয়েকজন মহিলা জড়ো করে পাঠালাম সেখানে। তারা সম্পূর্ণ ব্যবস্থা নিলো।

সেই মহিলাকে আমাদের এখানে দু'দিন রাখলাম। তার স্বামী বেচারা চাকুরীজীবি। শহর ছেড়ে পায়ে হেটে যাচ্ছিলো পোয়াতি স্ত্রী নিয়ে নোয়াখালী। পথিমধ্যে এ ঘটনা। এমনি হাজারো ঘটনা ঘটেছে বাংলার সর্বত্রই তখন। আমি পরে একটি নৌকা দিয়ে যতদূর পারা গেলো তাদের এগিয়ে দিয়ে আসলাম। অবশ্য যেখানে তাদের পৌঁছালাম, সেখান থেকে যান-বাহন হিসেবে অন্তত: রিক্সা পাওয়া গিয়েছিলো। তাদের যাবার একটি ব্যবস্থা করতে পেরে নিজের মনে পরম শান্তি পেয়েছিলাম। *সেই মহিলাটির অবস্থা দেখেই মনে হয়েছে আমাদের পুরো দেশটিও তখন পোয়াতী। সন্তান প্রসব যন্ত্রণায় তখন ছটপট করছে। সে সন্তান দেবে যার নাম হবে বাঙালি জাতি.....।। অবশেষে সে দিয়েছেও তা।*

বাংলাদেশের মানুষের দুর্ভোগ তখন চরমে। তখন আমাদের শ্রষ্টা নীরবে হাসছিলেন বলেই আমার মনে হয়েছে। সেই দুর্ভাগা জাতির দুর্ভোগ আজও শেষ হয়নি। এখনও পদে পদে দুর্ভোগ!! নিয়তি যেন এ জাতির ললাটে দুর্ভোগের স্থায়ী সীলমোহর লাগিয়ে দিয়েছে!।

দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। খবরাখবর জানার জন্যে তখন সবারই সম্বল ছিলো রেডিও। যার মাধ্যমে জানা যাবে দেশে কী হচ্ছে! সে সময়ে রেডিওতে মাধ্যম হয়েছিলো শুধু আকাশ বাণী কোলকাতা এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও। ঢাকা রেডিও কেন্দ্র যেহেতু পাকবাহিনীদের দখলে, তাদেরকে তো কোনভাবেই বিশ্বাস করা যায় না। আমার বড় ভাই পাকিস্তান হতে আসার সময় তখনকার দিনে পঁচিশ রুপিয়া দিয়ে খরিদ করে এনেছিলেন একটি ফিলিপ্স রেডিও। পুরো এলাকায়ই ঐ একটি রেডিও ছিলো সবে ধন নীল মনি। যার জন্যে এলাকার প্রায় সবাই এসে জড়ো হতেন আমাদের রেডিওটার পাশে খবরা-খবর জানার জন্যে ।

২৬ মার্চ'৭১ সকালে হঠাৎ চট্টগ্রামের কালুর ঘাট রেডিও স্টেশন (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র) থেকে জনৈক এম, এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর পাঠানো স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র পাঠ করলেন। স্বাধীনতা শব্দটি শোনেই হৃদয়টি যেন নেচে উঠলো। একই পত্র আবার বেলা ২টায় পড়লেন। চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম রেডিও স্টেশনের সমস্ত প্রোগ্রামই পরিস্কার শোনা যেত। পরে জেনেছি সেই ঘোষণা পাঠক ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং ডাকসাইটের নেতা। আরও একটা ঘোষণার কথা শোনেছি আমার প্রয়াত দাদা দেওয়ান হাকিম উদ্দীন এর কাছে। তিনি বলেছিলেন সেই ঘোষণাটি যে পাঠ করেছেন, তিনি নাকি তার নাম উলেখ করেছিলেন আবুল কাশেম সন্দ্বীপ বলে। দাদাকে সঙ্গে সঙ্গেই বললাম-আপনার মনে নেই দাদা এ ঘোষণা যে আমরা ৭ই মার্চে ঢাকা রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর ভাষণেই শোনেছি..... এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম.... এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম... যা তখনকার রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র থেকে ৮ই মার্চ'৭১ এ প্রচারিত হয়েছিলো।

তারপর আবার একই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন ২৭ মার্চ'৭১ বিকেলে একজন অপরিচিত মেজর জিয়াউর রহমান। পরবর্তীতে সৌভাগ্যক্রমেই যিনি দেশটির রাষ্ট্রপ্রধানও হয়েছিলেন। তিনি উলেখ করলেন (আমার যতটুকু মনে আছে) বিপবী বাংলা বেতার কেন্দ্র নাকি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র) থেকে আমি মেজর জিয়া বলছি....আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আমি ঘোষণা করছি আজ হতে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র .....দেশবাসী আপনারা সবাই স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ুন....।। ইংরেজী ভাষণেও তিনি যেমন উলেখ করেছিলেন...'অন বিহাফ অব আওয়ার গ্রেট লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'....।।

অথচ এখনকার আমাদের দেশের কিছু ভাড়াটে ইতিহাসবেত্তা, 'ওয়েদার কক্' এবং ক্ষমতাবানেরা এই দিবালোকের মতো সত্য-সহজ বিষয়টিকে নিয়ে এমন ধুম্রজালের সৃষ্টি করেছেন। পরিস্কার বিষয়টির উপর এমন কুয়াশার চাদর বিছিয়ে দিয়েছেন। ইতিহাসকে বানিয়েছেন নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো কল্পলোকের গল্প। অথচ ইতিহাসতো নিজ গতিতেই চলে। না। ওনারা দিচ্ছেন না ইতিহাসকে তার নিজ গতিতে চলতে। যার ফলে আমাদের নতুন প্রজন্ম স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস থেকে বহুদূরে নিক্ষেপিত হচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে তাদের শেখানো হচ্ছে একটি বিকৃত ও খন্ডিত ইতিহাস।

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান যিনি '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে একটি সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর অসামান্য অবদান জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় কখনো তাঁর মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে একবারও কটুক্তি করেননি। নিজে কখনো বলেননি যে, তিনি নিজেই একমাত্র স্বাধীনতার ঘোষক। যার জন্যে ওনার প্রতি শুরু থেকেই আমার মাঝে আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ কাজ করে আসছে। অথচ তাঁর উত্তরসুরী ও বশংবদরা আজ অবলীলায় একটি ঢাহা মিথ্যেকে এমনভাবে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। শুধু তাই নয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্রের এমন বিকৃতি ঘটিয়েছে, সে জন্যে পুরো জাতি আজ হতবাক এবং ক্ষুব্ধ। তাতে 'লেটেস্ট জেনারেশান'কে, দেশকে এমনকি জাতিকে দিনকে দিন অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছে। রীতিমতো বিতর্কিত করে তুলছে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানকে তারই উত্তরসুরি আর বশংবদরা। আর এদিকে আমাদের যে সকল সন্তানেরা বিদেশে বেড়ে উঠছে। তারা দেখে না মুক্তিযুদ্ধ, জানে না মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। বাঙালি জাতির হাজার বছরেরও শ্রেষ্ট অর্জন মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা। সে সরল সত্যটিকে এড়িয়ে প্রবাসের স্কুলগুলোতে প্রভুভক্ত সারমেয়রা বাচ্চাদের শেখাচেছ যত্তসব উদ্ভট এবং বিকৃত ইতিহাস। আমাদের আজকের প্রজন্মকে কৌশলে বিকৃতির অন্ধকারে ডুবিয়ে দেয়া হচ্ছে, সঠিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সুর্যদীপ্ত আলো হতে। প্রতিবাদ কে করবে?! এখানকার মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা স্বপক্ষের শক্তিগুলো শত খন্ডে খন্ডিত হয়ে আছে !!

এ প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল (অব:) সুবিদ আলী ভূইঁয়া পিএসসি কর্তৃক লিখিত ***'প্রসঙ্গঃ স্বাধীনতার ঘোষণা'*** শিরোনামের নিবন্ধটি প্রণিধানযোগ্য। যা প্রকাশিত হয়েছে জাতীয় দৈনিক যুগান্তর এ *(শুক্রবার ২৬মার্চ'০৪ইং স্বাধীনতা দিবস বিশেষ সংখ্যায়)*। তিনি তাঁর নিবন্ধে বলেছেন- "আর মেজর জিয়া জীবদ্দশায় নিজেকে কখনও 'স্বাধীনতার ঘোষক' বলে দাবী করেননি। এমন কি স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালের ২৬ মার্চ *সাপ্তাহিক বিচিত্রায়* ***'একটি জাতির জন্ম'*** শীর্ষক যে নিবন্ধটি মেজর জিয়া নিজে লিখেছিলেন, তাতেও নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে উলেখ করেননি। এমনকি '৭৪ সালের *বিচিত্রায়* প্রকাশিত সে নিবন্ধে জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুকে ***'জাতির পিতা'*** হিসেবে সম্বোধন করেছিলেন। আজ কেন বিশেষ মহল মেজর জিয়াউর রহমানকে ***'স্বাধীনতার ঘোষক'*** বানাতে উঠে পড়ে লেগেছে- সেটাই চিন্তার বিষয়।"

জেনারেল ভূইঁয়া ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ'৭১ এ রমনা রের্সকোর্সে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভাষণের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন তার নিবন্ধে। তাহলো- 'বঙ্গ বন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিলো ১৮ মিনিটের। তাতে ছিলো ১০০৭টি (একহাজার সাত) শব্দ। আর সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি ছিলো অলিখিত........।'

অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রার নির্বাহী সম্পাদক, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিষ্ট এবং একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির কর্মকর্তা জনাব শাহরিয়ার কবির। ***"মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস ধর্ষণকারীদের ক্ষমা নেই"*** শিরোনামে দৈনিক জনকন্ঠের চতুরঙ্গ বিভাগে *(১১জুলাই'০৪)* এ প্রকাশিত তাঁর একটি বিশেষ নিবন্ধে ....

তিনি বলেন –....হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় ১৯৮২ সালের নভেম্বরে ১৫ খন্ডে স্বাধীনতা যুদ্ধের যে দলিলপত্র প্রকাশিত হয়েছিল তা সম্পুর্ণ না হলেও এর কোন তথ্য সম্পর্কে এতকাল কেউ কোন প্রশ্ন তোলেনি। কারণ এই পনেরো খন্ড কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা লিখিত ইতিহাস নয়, এগুলো ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংক্রান্ত দলিলপত্রের সঙ্কলন।

জিয়া নিজের জীবদ্দশায় তাঁর স্বাধীনতা সংক্রান্ত বেতার ভাষনের তারিখ ২৭ মার্চ বলে উলেখ করেছেন, ২৬ মার্চ নয়। বঙ্গাবন্ধুকে ***জাতির জনক*** আখ্যায়িত করে জেনারেল জিয়া বঙ্গাবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকেই স্বাধীনতার ***'গ্রীন সিগন্যাল'*** হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। জেনারেল জিয়া যদি জানতেন তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী তাঁকেই মিথ্যাবাদী বানিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে জোটীয়করণ করবেন, তাহলে তিনি নিজেই তাঁর ২৭ মার্চের ভাষণকে ২৫ মার্চ হিসাবে চালাতেন। জেনারেল জিয়া ২৫ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এমন অসম্ভব মিথ্যাচারের কোন রেকর্ড '৭১ এর মার্চ থেকে জিয়ার মৃত্যু পর্যন্ত কোথাও কেউ নথিবদ্ধ করেনি।

২৭ মার্চ জিয়া তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে নিজেকে বাংলাদেশের অস্থায়ী বিপবী সরকারের প্রধান হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন বটে, তবে পরের ভাষণেই এই ভুল শুধ্রে নিয়ে 'মহান নেতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে' স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলেছেন – যা পৃথিবীর বহুদেশে বেতার কেন্দ্রের আর্কাইভে নথিবদ্ধ রয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি পর্ব সম্পর্কে আমি গত দশ বছর ধরে তথ্য সংগ্রহ করছি। এই তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ২৬ মার্চ বঙ্গাবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা কীভাবে বর্হিবিশ্বে প্রচারিত হয়েছে সে দলিলের অনুলিপি আমার সংগ্রহে রয়েছে।

২৭ মার্চ ভারতের সকল শীর্ষস্থানীয় দৈনিকের প্রথম পাতার খবর ছিল – 'শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন'। খালেদা-নিজামীর পোষ্য ইতিহাস রচয়িতা এমাজউদ্দীন-মনিরুজ্জামান মিঞা গং যখন বলেন বঙ্গাবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কোন প্রামাণ্য তথ্য তাঁরা খুঁজে পাননি তখন সন্দেহ জাগে তাঁদের মনুষ্য অবয়ব সম্পর্কে। তাঁরা প্রমাণ করেই ছেড়েছেন দুই পায়ে হাঁটলে যেমন মানুষ হওয়া যায় না, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলেই শিক্ষিত হওয়া যায় না। খালেদা- নিজামীদের তুষ্ট করার জন্য স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস ধর্ষণ করে এমাজ-মিঞারা নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন প্রভুভক্ত সারমেয়কুলের পঙক্তিতে......।

এ প্রসঙ্গো বাংলাদেশের আরও কয়েকজন খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও কলামিষ্টদের বিভিন্ন পত্রিকায় এবং গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি – ***"ইতিহাসের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়া"*** শিরোনামে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত *(১১ জুলাই'০৪)* প্রখ্যাত লেখক-কলামিষ্ট বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর তাঁর নিবন্ধে বলেন- বিএনপি কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র সংশোধন করে পঞ্চদশ খন্ড প্রকাশ করেছে। এই সংশোধিত দলিলে বলা হয়েছে : জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম রাষ্ট্রপতি, প্রথম এবং একমাত্র ঘোষক। সত্য হচ্ছে জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের তৃতীয় ঘোষক এবং জিয়াউর রহমান বঙ্গাবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। বিএনপি কর্তৃপক্ষের ইতিহাস সংশোধন যদি সত্য হয়, তাহলে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণা কেন কোন দেশ স্বীকার

করেনি, কেন মুক্তিযুদ্ধের সময়ে জিয়াউর রহমান একজন সেক্টর কমান্ডার হিসাবে জীবন যাপন করেছেন? এসব করে কি খালেদা জিয়া এবং তাঁর পরিবার এবং তাঁর দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে? ইতিহাস তো ফালুদের মতো অনুগৃহীত ব্যক্তি নয়। খালেদা জিয়া নিজেকে ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। সেখান থেকে সরে আসার কোন পথ নেই। তিনি সর্বশক্তিমান নন......।

দৈনিক আজকের কাগজ *(১৮ জুলাই'০৪)* এর সংখ্যায় প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলাম লেখক বেবী মওদুদ ***"মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি"*** ...শিরোনামের নিবন্ধে লিখেছেন – ২৫ মার্চ রাতে জেনারেল ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করে এবং নির্দেশ দিয়ে যায় নিরস্ত্র বাঙালি হত্যার। আর শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন তাঁর ঐতিহাসিক ৩২নং সড়কের বাড়ি থেকে। সে ঘোষণা টেলিগ্রাম, টেলিফোনের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে সর্বত্র দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছানো হয়। ২৬ মার্চ তা সকলের হাতে পৌঁছায়।

২৭ মার্চ কালুর ঘাটে স্বাধীন বাংলার যে বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হয় সেখানে প্রথম সেটা পাঠ করেন এম এ হান্নান ও অন্যান্যরা। তারপর এক খেয়াল হলো, তারা একজন আর্মির লোক দিয়ে তা পাঠ করার জন্য মেজর রফিকের (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বহু মূল্যবান গ্রন্থ ***" লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে"*** র রচয়িতা) কাছে খবর দিলে তিনি বলেন, 'আমি ব্যস্ত আছি, জিয়াকে বলেন ও পড়ে দিয়ে আসবে।' এভাবে জিয়াকে নিয়ে এসে বসিয়ে কয়েকবার পড়ানো হয় এবং সেখানে তিনি স্পষ্ট উচ্চারণ করেন যে, আমি মেজর জিয়া বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেদিন যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, এ তো চিরন্তন সত্য। আর তার পক্ষে জেনারেল জিয়া যে সেই ঘোষণা পাঠ করেছিলেন সেটা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মোহাম্মদ বেলাল ও আবুল কাসেম সন্দীপও তাদের লেখায় উলেখ করেছিলেন। তখন মেজর জিয়া না পড়ে অন্য কোনও ক্যাপ্টেন ও মেজর পড়লেও পারতেন – এ নিয়ে এখন এই বিতর্ক তুলে বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের জাতি হিসেবে এমন হেয় করার উদ্দেশ্য কী?

"জোট সরকারের শাসন " শিরোনামের কলামে কথাসাহিত্যিক ও কলাম লেখক হরিপদ দত্ত বলেন – শেষ রক্ষার জন্য জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে একের পর এক চলছে অবিশ্বাস্য সব কান্ডকারখানা। স্বাধীনতাকে পদদলিত, লাঞ্ছিত, রক্তাক্ত করছে যারা তারাই কিনা এর 'ঘোষক' নিয়ে রাতদিন উন্মাদের কান্ড করে যাচ্ছে। সংবিধান আর পবিত্র নেই। ইতিহাসও হয়ে গেছে লুটের মাল। জিয়া যে স্বাধীনতার ঘোষক এটা প্রমাণের জন্য উন্মাদের যে আচরণ চলছে, জনগণ হাসবে না কাঁদবে, ভেবে পাচ্ছে না। সন্ত্রাসী লুটেরা আর সাম্রাজ্যবাদের হাতে দেশের সার্বভৌমত্ব তুলে দিয়ে কিনা স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে এতো হাস্যকর চেস্টা। এ যেন কুষ্ঠরোগীর আঙ্গুলের নখ হারানোর জন্য দুশ্চিন্তা......।

''স্বাধীনতার শত্রুরা যখন দেশের রং বদলায়" উক্ত শিরোনামে সুসাহিত্যিক কে.জি. মুস্তাফা *(১৯ জুলাই'০৪ দৈনিক জনকণ্ঠ)* এর সম্পাদকীয় কলামে একটি চমৎকার লেখা লেখেন। তাঁর লেখার একটি অংশে তিনি উলেখ করেন–১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের, তথা বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার জন্য ড. মাযহারুল ইসলামকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করেন। ওই কমিটির কাজ ছিলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়ন করা। বঙ্গবন্ধু টেলিফোনে জানালেন আমাকে ওই কমিটির সদস্য করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি আপত্তি জানালাম এই কারণে যে, দেশে অনেক গুণী ইতিহাসবিদ আছেন, তাঁদের নিয়ে এই কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

ড. এ-আর মল্লিক, ড. সালাউদ্দিন প্রমুখ কয়েকজনের নামও উলেখ করলাম কমিটির সদস্যরূপে নিয়োগ করার জন্য। আমি কমিটিতে থাকব না এ কথা পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিলাম বঙ্গাবন্ধুকে। আরও একটি কথা আমি উলেখ করেছিলাম। আমার মতে, ড. মাযহারুল ইসলাম বাংলার অধ্যাপক হয়ে ইতিহাস রচনার কমিটিতে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলে অনেকেই আপত্তি জানাবেন।
বঙ্গাবন্ধু তাঁর ওই প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে সম্মত হন। বর্তমান সরকার একতরফাভাবে ইতিহাস রচনার প্রকল্প ও ১৫ খন্ড দলিলের কাটাছেঁড়া ইত্যাদি নিয়ে যে কান্ড-কারখানা শুরু করেছে তাতে দেশের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক চিত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। তার পরিবর্তে পাওয়া যাবে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মহলের চক্রান্তের চিত্রাবলী। এসব চক্রান্তের জাল ছিন্ন করেই মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস খুঁজে বের করতে হবে। আমরা যদি নাও পারি, আমাদের সন্তানরা অবশ্যই সে কাজ সম্পন্ন করবে......।

"প্রসঙ্গা ঃ ইতিহাস বিকৃতি" (***সাপ্তাহিক২০০০*** জুলাই'০৪) সংখ্যায় উক্ত শিরোনামে বেশ ক'জন দেশ বরেণ্য ব্যক্তিত্বের কিছু মতামত সংকলিত করেছেন জনাব **সাইফুল হাসান**।

আমাদের দেশের প্রধান কবি ***শামসুর রাহমান*** বলেন - এখন যারা ক্ষমতায় তাদের আমি বিশ্বাস করি না। বঙ্গাবন্ধুই স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে যা চলছে, এটা তো অন্যায়। আমাদের দেশে যা এখন চলছে তার অনেকটাই ধোঁয়াটে। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিতর্কের কিছু নেই। একদম গোড়া থেকে দেখলেই স্বাধীনতার ঘোষক কে সেটা বোঝা যায়........।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীঃ স্বাধীনতার ঘোষক কে এটা নিয়ে বিতর্ক করা অপ্রয়োজনীয়। সময়ের অপচয়। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে এখন যে বিতর্ক চলছে সেটা রাজনৈতিকভাবে করা হচ্ছে। ঐতিহাসিক কোন কিছু নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে না। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি বিষয়টি যে যার দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। পুরো জাতিকে অহেতুক বিতর্কের মাঝে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। যদিও আমার মনে হয় জাতি এই বিতর্কের সঙ্গো নেই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকার বদলের সঙ্গো সঙ্গো ইতিহাস বদলের ঘটনা আমাদের এখানে ঘটছে। কিন্তু মুল ব্যাপার হলো, ২৫ মার্চের ঘটনার পর থেকে পুরো জাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাকিস্তানিদের প্রতিরোধ করেছে। আমরা স্বাধীন জাতি ঐতিহাসিকভাবে এটাই স্বীকৃত সত্য এখন, স্বাধীনতা শুধু একটি ঘোষণার ব্যাপার নয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সেই '৫২ সাল থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলছে। যার ধারাবাহিকতায় আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি........ ।

১৬ জুলাই'০৪ *দৈনিক আজকের কাগজ* এর খোলা হাওয়া বিভাগে ***"মুক্তিযুদ্ধ নয়, রাজাকারদের মন্ত্রনালয়"*** শিরোনামে বিশিষ্ট কলামিষ্ট, লেখক, রাজনীতিবিদ ও প্রাক্তন তথ্য-প্রতিমন্ত্রী ***অধ্যাপক আবু সাইয়িদ*** বলেন - ১৯৭৫ সালের ২৬মার্চ ***'বাংলাদেশ সংবাদ'*** ম্যাগাজিনে বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ***"স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা"*** শিরোনামে ম্যাগাজিনের শেষ প্রচ্ছদে বঙ্গাবন্ধুর নিম্নোক্ত বাণীটি প্রচারিত (প্রকাশিত) হয়। .....'পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতে পিলখানা, ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমন করেছে এবং শহরের লোকদের হত্যা করছে। ঢাকা, চট্টগামের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতি সমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তি যোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গো মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গো যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আলাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ, দেশকে স্বাধীন করার জন্যে শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্যে পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গাল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান।

কোনও আপোস নেই, জয় আমাদের হবেই। আপনাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুণ। সকল আওয়ামীলীগ নেতা, কর্মী এবং অন্যান্য সকল দেশ প্রেমিক ও স্বাধীনতা প্রিয় লোকদের এই সংবাদ পৌঁছে দিন। আলাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন.......... **জয় বাংলা।**

উক্ত ***বাংলাদেশ সংবাদ*** ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বাংলা বাণীটির নিচে লেখা রয়েছে - 'চট্টগ্রাম ইপিআর অয়্যারলেস ঘাঁটি এবং জহুর আহমদ চৌধুরীকে প্রেরিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বাণী' যারা এই বাণী গ্রহণে ও প্রেরণে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন: কে, এস, এম, এ হাকিম, মোহাম্মদ জালাল আহম্মদ, আবুল কাসেম খান, জুলহাস উদ্দিন, আবুল ফজল ও শফিকুল ইসলাম।

স্মরণযোগ্য যে এ বাণীটিই কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথমে ২৬ মার্চ দুপুর ২টায় সেখানকার আওয়ামীলীগ নেতা এম এ হান্নান ও পরের দিন ২৭ মার্চ '৭১ কিছুটা পরিমার্জনাসহ তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান পাঠ করে শোনান......।

এবার আমরা একজন মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারের কথা শুনবো......১৯৭১এর ২৫মার্চে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের প্রথম সেনাবিদ্রোহের মহানায়ক মেজর রফিক। যাঁর পরবর্তীতে পরিচয় মুক্তিযুদ্ধের ১নং সেক্টর কমান্ডার ***মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম*** । ২৫মার্চ রাত ৮ঃ৪০মিনিটে তিনি তাঁর অধীনস্থ ইপিআর এর বাঙালি সৈনিক ও জেসিও-দের নিয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেন এবং রাত ১১ঃ৩০মিনিটের মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্ধ, ছাত্র-জনতার সম্মিলিত সহায়তায় সমস্ত চট্টগ্রাম শহর দখলে আনতে সক্ষম হন.......।

এই অসমসাহসী মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক লিখিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল***"লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে"*** গ্রন্থের ইনারলীপে উপরোলিখিত বর্ণনাটি দেয়া আছে। ১৯৮১ সালে জাতীয় সংসদে বইটি মুক্তিযুদ্ধের বিশ্বস্ত দলিল হিসেবে বহুল আলোচিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস বিকৃত, অস্পষ্ট ও ঝাপসা হয়ে যাওয়ার পূর্বেই মুক্তিযুদ্ধের এক অগ্রণী সৈনিকের সচেতন প্রয়াসে রচিত এই গ্রন্থ মহান মুক্তিসংগ্রামের এক বিশ্বস্ত দলিল।

জনাব মেজর ইসলাম তাঁর গ্রন্থের ভূমিকার ৭ম প্যারায় লিখেছেন - 'আমরা ২৫ মার্চ রাত ৮ঃ৪০মিনিটে চট্টগ্রামে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার তিন ঘন্টা পরেও অবশ্য কিছু বাঙালি সামরিক অফিসার পাকিস্তানিদের ঘনিষ্ট সহযোগী হিসেবে কাজ করে চলেছিলেন একযোগে- এবং চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গারকৃত সমুদ্রগামী মালবাহী জাহাজ এম, ভি সোয়াত থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নামিয়ে আনার কাজ বিশ্বস্থতার সাথে পালন করে যাচ্ছিলেন। পাকিস্তানিরা পরে এই সব অস্ত্র ও গোলাবারুদই ব্যবহার করেছিল লক্ষ লক্ষ বাঙালি হত্যায়। তবে উলেখিত বাঙালি সামরিক অফিসারগন নিতান্তই সৌভাগ্যবান যে, কঠিন সংকটের ঠিক ক্রান্তিলগ্নে পাকিস্তানিরা তাঁদের হত্যা করতে পারে এ কথা চিন্তা করে তাঁরা আমাদের সাথে যোগ দেন। স্বতঃস্ফূর্ততা নয়, সার্বিক অবস্থা এবং স্বীয় নিরপত্তার বিবেচনাই তাঁদেরকে শেষ মুহূর্তে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করে।'

১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি থানার নাওড়া গ্রামে জন্মগ্রহণকারী এই বীরউত্তম মুক্তিযোদ্ধা তাঁর লেখা ৪১৬ পৃষ্ঠার ***"লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে"*** গ্রন্থের ১৩০-১৩১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন.......ওদিকে ক্যান্টনমেন্টে (চট্টগ্রাম) আক্রমন করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম বিধায় আমি শহরের বাইরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যেতে পারছিলাম না। আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ তখন প্রতিমুহূর্তে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। তখন আমি তাঁদের অনুরোধ করি তাঁরা যেন কালুরঘাট ব্রিজ

এলাকা থেকে যে কোন একজন সিনিয়র বাঙালি আর্মি অফিসারকে দিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে একটা বিবৃতি পাঠ করান যে, সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার, জেসিও ও সৈন্যরা জনগণের সাথে মিলে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

সেদিন অপরাহ্ণেই তাঁরা কালুরঘাট ব্রিজের পূর্ব প্রান্তে গিয়ে দেখেন মেজর জিয়া তখনও সেখানে আছেন। আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দের অনুরোধে ২৭ মার্চ বিকেল বেলা মেজর জিয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আসেন এবং সেদিন সন্ধ্যায় তিনি সেখান থেকে একটি ভাষণ দেন। রেডিওতে তাঁর প্রথম ভাষণে তিনি নিজেকে 'রাষ্ট্রপ্রধান' বলে উলেখ করলেন। কিন্তু ঘোষণায় এ ধরণের বক্তব্য আসার কথা নয়। কথা ছিল যে, তিনি রেডিওতে ভাষণে বলবেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং বাঙালি মিলিটারী, ইপিআর ও পুলিশ জনগণের সাথে মিলে পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

নিজেকে 'রাষ্ট্রপ্রধান' হিসেবে উল্লেখ করে ভাষণ দেয়াটা সম্ভবত: সে সময়ের উত্তেজনাকর মানসিক অবস্থায় অসাবধানতার কারণেই হয়েছিল। এবং এটা একটা অনিচ্ছাকৃত ভুল। স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার অধিকার সামরিক অফিসারদের নেই। সে অধিকার শুধুমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের.....। নিজেকে 'রাষ্ট্রপ্রধান' ঘোষণা করা যে একটা গুরুতর ব্যাপার এবং ভুল মেজর জিয়া তা বুঝতে পারলেন এবং নতুন করে তৈরী একটি বিবৃতি রেডিওতে পাঠ করে শোনান। এবার তাঁর ভাষণে তিনি দ্ব্যর্থহীন এবং পরিস্কারভাবে উলেখ করলেন যে, তিনি বক্তব্য রাখছেন বাঙালি জাতির নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে.........।।

আমার নিজের সরাসরি শোনা এবং দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের বক্তব্যগুলো পড়ার পর এটা দিবালোকের মত সত্য যা তা হলো- তিনি (মেজর জিয়া) ছিলেন স্বাধীনতা ঘোষণা পত্রের দ্বিতীয় পাঠক। যদি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেই স্বাধীনতার ঘোষক হওয়া যায়, তাহলেতো বলতেই হয় সে ঘোষণা পত্রটিতো প্রথম পাঠ করেছিলেন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামীলীগের নেতা জনাব এম, এ হান্নান। তাহলে তো তিনিই স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক। আর দ্বিতীয় ঘোষক মেজর জিয়া নয় কি (?!)

যদিও বঙ্গবন্ধুর পাঠানো স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রের দ্বিতীয় পাঠক হিসেবে উচ্চারণ করতে আমরা বার বারই জনাব আবুল কাসেম সন্দ্বীপ এর নাম বেমালুম ভুলে থাকি.......!

সেই কিশোর বয়সেই শরীরে স্বাধীনতার জন্যে আবেগের জোয়ার এর কোন অন্ত ছিলো না। তখনও আমার জানা ছিলো না, স্বাধীনতার জন্যে এতো ত্যাগ এবং এতো রক্ত ঝরাতে হয়। এতো নির্যাতন ভোগ করতে হয়। মা-বোনের এমন পাইকারীভাবে ইজ্জত হারাতে হয়।! জানা ছিলো না আমাদের দেশের কিছু লোকেরা নিজ দেশটার সঙ্গে গাদ্দারী করবে। নিজেদের মা-বোনের ইজ্জতের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করবে। ওরা স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি। পাকিস্তানের দালাল, চাটুকার। যাদের চরিত্রের আজও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। যদিও তাদের সীমাহীন সৌভাগ্যের ফলেই পেয়েছিলো সাধারণ ক্ষমা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে। সে ক্ষমার মর্যাদা কি তারা রক্ষা করেছে ?

বার বার বঞ্চনার শিকার হয়ে নিজ দেশেই যখন মানুষ পরবাসী হয়ে যায়। পেছনে যেতে যেতে যখন মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়। শুধু তখনই আত্মরক্ষার জন্যে সে প্রথমে প্রতিরোধ করবে। যদি তাতেও জীবন বিপন্ন হতে থাকে। তখন প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হবে। আমাদের জন্যেও সেই সময়টি এসেছিলো একাত্তরের দিনগুলোতে। আমাদের ঘাড়ে একটি অসম যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত একটি নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে আমরা যুদ্ধে নামলাম গাঁইতি-শাবল-টেটা-যুঁতি-দোনালা বন্দুক আর দু'চারটা গাদা রাইফেল নিয়ে।

না। চাঁদপুরের বাড়িতে আর থাকা সম্ভব হলো না। কেন না ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের নাপাকবাহিনী চাঁদপুরে এসে টেকনিক্যাল হাই স্কুলে তাদের স্থায়ী আস্তানা গেড়েছে। বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে। কোন কারণ নেই, কিন্তু নেই। যেখানে সেখানে তারা নিরীহ মানুষদের গুলী করে হত্যা করছে। মনে হচ্ছে যেন তারা পাখি শিকারে এসেছে। কিংবা বন্দুক দিয়ে হাতের নিশানা ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করছে। স্থানীয় আমাদের কিছু স্বজাতি ভাইয়েরা তখন পাকিস্তানী সেনাদের সহযোগীতা করতে শুরু করেছে। তাতে এলাকায় থাকা আরো বেশী বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

আমরা নিজ বাড়ি ছেড়ে (যা জেলা শহরের খুব কাছে) পরিবারের সবাই গ্রামের গহীনে দুরের এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। কিছুকাল যেতে না যেতেই সেখানেও ভয় নিয়মিত হানা দিতে থাকলো। পরে একদিন মা ডেকে বললেন- 'বাজান, তুই যদি এইভাবে গেরামে পইড়া থাহস, তাইলে তোরেও হারাইতে অইবো চোহের সামনে। বড় পোলাডা ছুডিতে আইয়া কোন্ডাই আরিয়ে গেল। আললাহ্ মাবুদ জানে। তুই একটা কাম কর বাপ কারা কারা যেন ইন্ডিয়া যায় টেরেনিং লইতে। তুইও হেয়ানে চইলা যা। তারপর মুক্তি বইন্যা আইসা দেশের লেইগ্যা যুদ্ধ কর। মরতে যদি অয় বাবা তাইলে যুদ্ধ কইরাই মরিস। হেইডাতে দাম আছে। আমি আলাহ্-খোদার নাম জইপ্যা বুহে পাষাণ বাইন্দাই থাহি।

অগত্যা শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে আগ্রহী যারা সেই সব যুবক-কিশোর-মাঝবয়েসীদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম ভারতের উদ্দেশ্যে। যাবার সময় মা তার আঁচলের গিট খুলে তার জোলাতি (জমানো) পয়সা মোট সাত টাকা বারো আনা ছিলো সবই দিয়ে দিলেন। সঙ্গে দিলেন কিছু চিড়া এবং আখের গুড়। বলা যায় একটি দেশ ছেড়ে অন্য একটি দেশে যাবার সম্বল ঐ-ই ছিলো যা আমার মা পুটলি বেঁধে হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

গায়ে জোশের কোন কমতি ছিলো না তখন। বলা যায় হুজুগে বাংগাল। টানা চার পাঁচ রাতের পায়ে হেটে অবশেষে চোত্রাখোলা সীমান্ত পার হলাম। আমাদের গাইডারের নির্দেশে মাঝপথে কোথায় কোথায় যেন কোন নির্জন খা খা করা ভুতুড়ে বাড়িতে আশ্রয় নিতাম। কালো মিশমিশে সেই অন্ধকার ঘরে দিনের সুর্যের আলোর সময়টি পার করতে হতো। সে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। অবশেষে পরম কাঙ্খিত সীমান্ত আমাদের নাগালে এলো। সীমান্ত পার হতেই সমস্ত শরীর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছে। যে যেখানে পারলাম শুয়ে পড়লাম।

রাত তখন মনে করি দু'আড়াইটা হবে। গভীর অন্ধকার রাত। যেখানে একটু উঁচু জায়গা পেয়ে শোয়ার আরামের জন্যে বালিশের মত মাথা ঠেকিয়ে শুতেই গভীর ঘুমে ডুবে গেলাম। সকালে রোদের তেজে ঘুম ভাঙতেই দেখি সেটি একটি কবর। হায়! খোদা। আসে পাশে চেয়ে দেখলাম ছোট বড় শত শত কবর। একটু দুরেই দেখলাম একটি কবরের পাশে একটি লাশ গায়ের মাংশ ছেঁড়া-ফাড়া অবস্থায় এলোমেলো পড়ে আছে। বুঝলাম লাশটি হয়তো চাপা কবর দেয়া হয়েছিলো আর পাহাড়ি শৃগালেরা ঐ লাশকে তাদের আহার বানিয়েছে। হায়রে! বাঙলার বনি আদম। এদিক ওদিক থেকে দমবন্ধ করা দুর্গন্ধ আসতে থাকে। সীমান্ত পার হওয়া আমাদের দলের লোকজন তখনও সেই শত শত কবরের মাঝেই গভীর ঘুমে অচেতন।

রাত মানেই আমাদের জন্যে তখন ছিলো দিন। ভারতে পৌঁছার পথে বার বারই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। যাতে বার বারই নির্ঘাত মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছি। এখনও বেঁচে আছি সেটা বলা যায়

রীতিমতো একটি বিশাল বোনাস। সে বিপদের কারণ আমাদের স্বজাতি ভায়েরা মানে রাজাকার-আল বদর-আল শামস তখন সংখ্যায় এতো বেড়ে গিয়েছিলো যে, তাদের মাধ্যমে পাকসেনাদের ক্যাম্পে খবর পৌঁছে যেত বিদ্যুৎবেগে।

একটি বড় বিল পার হচ্ছিলাম এক কোমর সমান পানি ঠেলে ঠেলে। জলজ উদ্ভিদ আরালির ধারালো পাতায় কেঁটে যাচ্ছিলো পা হতে উরু পর্যন্ত। পঁচা শামুক আর কাটা পাটের ধারালো গোড়ার খোঁচায় পা কেটে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। থামার কোন উপায় নেই। কেননা গাইডারের নির্দেশে ধরে দেয়া একটি ছোট্ট সময়ের মধ্যেই সে স্থান পার হতে হবে নতুবা মহাবিপদ। দেরী হলে পাক-বাহিনীর কিংবা রাজাকারের গুলী খেয়ে জানটাই হারাতে হবে। আমরা একসঙ্গে প্রায় ৭০/৮০ জন কিশোর-যুবক বিল পার হচ্ছি। শত শত লাশ ভেসে আছে। লাশের গন্ধে নাক চেপে ধরেও কোন কাজ হচ্ছে না। লাশ ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছি। আমি সেই ছেলে যে নাকি মৃত লোকের কথা শুনলেই রাতের ঘুম নষ্ট হয়ে যেতো। কোন কবরস্থানের পাশ দিয়ে দিনের আলোতেও একা চলতে পারতাম না ভয়ে। আর সেই আমি লাশ ঠেলে কোমর পানির বিল পার হচ্ছি। মনে বিন্দুমাত্র কোন ভয়ভীতি কাজ করছে না।

বিল পার হতেই রাতের আঁধারে যে সকল গ্রামবাসী পথের পাশে জগ ভর্তি পানি, রুটি, চিড়া-মুড়ি যার যা ছিলো তাই নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো আমাদের একটু সহযোগিতা করার জন্যে। আর মুখে বলছে ভগবান-ইশ্বর-গড-আলার নিকট দোয়া করি বাজানরা তোমরাই আমাগো আশা। তোমরা যাও টেরেনিং নিয়া ঐ কুত্তাগুলারে মাইরা-খেদাইয়া দেশটা স্বাধীন কর। আমাগোরে একটু শ্বাস নিবার দাও.....। কোন রকমে বাইচ্যা থাকার একটু ব্যবস্থা কইরা দেও.....। আহ্ তাদের সেই আন্তরিকতার মাঝে সেদিন কোন ঘাটতি ছিলো না। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ওদের মতো গ্রামবাসীরাই এমনিভাবে নয়টি মাস মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে। দেশবাসীদের সহযোগীতাতেই সেদিন মুক্তিযুদ্ধ এত শক্তিশালী, এত অপ্রতিরোধ্য হয়েছিলো। তাতে দিকে দিকে পাকসেনারা হতে থাকলো নাজেহাল, পর্যুদস্ত এবং ভীত-সন্ত্রস্থ।

মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীকে আরও প্রাণ চাঞ্চল্যে, সাহসে উজ্জীবিত করে রেখেছিলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটি যিনি সদ্য প্রয়াত এম, আর আখতার মুকুল ভাই। তিনি তাঁর রচিত ও কথিত ***চরমপত্র*** টি দিয়ে আমাদের তথা পুরো দেশবাসীকে সাহসে, নব নব উদ্দীপনায় বুক ভরে রেখেছিলেন। তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্যে আর একটি মুক্তিযুদ্ধের প্রামান্য দলিল গ্রন্থ *'আমি বিজয় দেখেছি'*। যে গ্রন্থ আমাদের ভুলে যাওয়া পথঘাট বারবারই দেখিয়ে দেবে অত্যন্ত বিশ্বস্থতার সঙ্গে। মনে করিয়ে দেবে ভুলে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধের সঠিক কথাগুলো। অথচ তিনিই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন পরপারে, ঝরে গেলেন নিদারুণ অনাদরে, অবহেলায়। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই ও মাগফেরাত কামনা করছি।

জনাব ***এম আর আখতার মুকুল*** তিনি তাঁর মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন পূর্বে ২০০৪সালের ১০ এপ্রিল মুজিব নগর সরকার গঠনের ৩৩তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দৈনিক জনকণ্ঠের *(১০এপ্রিল'০৪) চতুরঙ্গ* বিভাগে একটি কলাম লিখেছিলেন। যার শিরোনাম ছিলো ***'প্রবাসী মুজিবনগর সরকার গঠনের নানা অজানা তথ্য'*** .... সেও তো আজ প্রায় ৩৪ বছর আগেকার কথা। ১৯৭০ সালে অবিভক্ত পাকিস্তানে সামরিক প্রহরায় অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকার করেন।

শুধু তাই-ই নয়, ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় বাংলাদেশে গনহত্যার দলিল 'অপারেশন সার্চলাইটে' দস্তখত করে করাচীতে পলায়ন করেন। এই গনহত্যার মোকাবিলায় ২৫ মার্চ গভীর রাতে

নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, এই ঘোষণার মাত্র ১৬ দিনের ব্যবধানে ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) গঠিত হয়েছিল। আজ ২০০৪ সালের ১০ এপ্রিল সেই মুজিবনগর সরকার গঠনের ৩৩তম বার্ষিকী........।।

ভারতে পৌঁছার পর চোত্রাখোলা নামক সেই সীমান্তবর্তী এলাকা হতে বাসে করে পাহাড়ের কোল বেয়ে বেয়ে রাজনগর, রাধানগর হয়ে পৌঁছে গেলাম কাঠালিয়া। সেখানে আমাদের বিস্তারিত রেকর্ড করা হলো। তৈরী হলো পুলিশ কার্ড। এখানে একদিন থাকার পর পাঠানো হলো মাচিমারা ক্যাম্পে। সেখানেও একদিন থাকার পর পাঠানো হলো আগরতলা কংগ্রেস ভবনে। সেখানেও বিভিন্ন রেজিস্টার বুকে লিপিবদ্ধ করা হলো আমাদের সকল ডাটা। এর পর সেদিন বিকেলেই আমাদের পাঠানো হলো আগরতলা শহরের অদুরে আমতলীর ইয়থ ক্যাম্পে।

আগরতলার উত্তরে প্রায় ৪/৫ কিলোমিটার দুরে আমতলী এলাকায় পৌঁছার পর সেই ছোট্ট পাহাড়ি শহরের ছোট-বড় পাহাড়ের উপর বেশ কয়েকটি ইয়থ ক্যাম্প নজরে এলো। যার একটির নাম ছিলো ***বঙ্গ শার্দুল*** ইয়থ ক্যাম্প। সেখানেই আমাদের থাকার জন্য সিলেক্ট করে দেয়া হয়েছে সেই আগরতলার কংগ্রেস ভবন হতে। তার আশে পাশের পাহাড়ের চুড়ায় আরও কয়েকটি ইয়থ ক্যাম্প যেগুলোর নাম রাখা হয়েছিলো আমাদের দেশের নদীগুলোর নামের সঙ্গে মিল রেখে। যেমন পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা ইত্যাদি।
সেই ইয়থ ক্যাম্পগুলোর অদুরে ছোট ছোট পাহাড়ের কোল ঘেষে যেখানে-সেখানে যত্রতত্র হাজার হাজার পরিবার পলিথিন এর ছাউনী ও সামান্য ঘের দিয়ে কিছুটা মাথা গোজার ব্যবস্থা করে পড়ে আছে। এ সকল শরণার্থী বাংলাদেশ থেকে এসেছে। জেনেছি শুধুমাত্র পাকবাহিনীর সেই বর্বরোচিত অত্যাচারের ভয়েই জান বাচিঁয়ে এক কোটিরও বেশী বাঙালি শরণার্থী সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। যাদের খাওয়া-থাকার পুরো দায়-দায়িত্ব তখনকার ভারত সরকারের ঘাড়ে চেপে বসে।

এই বিশাল জনগোষ্ঠির ভার বহন করা ভারত সরকারের পক্ষে রীতিমতো দুরূহ হয়ে পড়ে। সেখানে তখনও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। তার জন্যে প্রকৃত বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে এনে তাদের সমর্থন পাওয়াও বেশ সময়ের ব্যাপার। তাইতো অর্ধাহারে অনাহারে হায়রে! সেখানে পাইকারী দরে মেয়ে মহিলারা ইজ্জতের বলি দিতে দেখেছি। হায়রে! অভাগা দেশের অভাগা মানুষ! প্রচন্ড মনোকষ্টে বারবারই কিশোর মনে প্রশ্ন জেগেছে আমাদের এই জাতির কষ্টের কী শেষ নেই?

আমাদের ইয়থ ক্যাম্পে সকালে একমুঠো চিড়া আর কয়েকটি বাতাশা দিয়ে নাস্তা দেয়া হতো টানা একঘন্টা শরীর চর্চার পর। দুপুরে একমুঠো ভাত ও ডাল। রাতে একটি রুটি আর কিছু ডাল। ডাল এবং রুটি উভয়ের মধ্যেই কঙ্কর ও করাতি বালু থাকতো। যা কোনভাবেই খাওয়ার উপযুক্ত নয়। তবুও যাই পেতাম তাতে কারোই পেট পুরতো না। পঁচা চাউলে পোকা, করাতি বালু সব সময়ই চোখে পড়তো। তারপরও কোনভাবে কিছু খেয়ে পাহাড়ি ঝরণার পানি খেতাম পেট ভরে। যা খেয়ে খেয়ে একদিন রক্ত আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। তেমনি আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলো ক্যাম্পের প্রায় অনেকেই।

দিন যেতে থাকে এমনিভাবে। চিন্তা একই- কবে ট্রেনিং নিয়ে দেশের মাটিতে ফিরে যাবো এবং দেশের জন্যে কিছু কাজ করতে পারবো। খবর এলো একদিন মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এম এ জি ওসমানী

ইয়থক্যাম্পগুলো ***ভিজিটে*** আসছেন। আমরা জড়ো হলাম তিতাস ক্যাম্পে। আমাদের দলনেতা আমাদের সবাইকে সেনাবাহিনীর স্টাইলে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

শাদা তলোয়ারী গোঁফের সেই মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক সৌম্যমূর্তির এম এ জি ওসমানী এলেন। লাইনে লাইনে ঘুরে ঘুরে সবাইকে দেখলেন। কুশল জিজ্ঞেস করলেন। জেনারেল ওসমানীকে কাছে থেকে সেটাই আমার প্রথম এবং শেষ দেখা।

অবশেষে সবার উদ্দেশে সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানী বললেন- তোমরা অপেক্ষা কর। আমাদের কাছে এখন হাতিয়ার নেই। সহসাই হাতিয়ারের একটি বড় চালান পাবো বলে আশা করি। তখন তোমাদের ট্রেনিংএ নেয়া হবে। আমাদের দেশটির জন্যে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হবে। অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। অনেক হারাতে হবে। স্বাধীনতা খুব সহজে আসে না। ইহা সহজলভ্য ছেলের হাতের মোয়াও নহে। তার জন্য লাখো বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে হয়। আমাদের এই অভাগা দেশটার মাটি এখন চরম রক্ত তৃষ্ণায় ছট্‌পট্ করছে। তাই এখন থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত হও। নিজেদের শক্ত কর। হয়তো বহুদিন, হয়তো বহুমাস-বছর ধরে তোমরা শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে।

সেই দেখাই জেনারেল ওসমানীকে আমার শেষ দেখা। দেশ স্বাধীন হবার পর ওনাকে আর দেখার সুযোগ হয়নি। সেখানে আমাদের সেই ইয়থ ক্যাম্পগুলোতে বিভিন্ন এলাকার ছাত্র নেতারা এসেছেন বিভিন্ন সময়ে। নিজেদের এলাকার ছেলেদের বেছে বেছে নিয়ে গেছেন। আমাদের এলাকারও ছাত্র নেতা, পাতি নেতা এবং বড় নেতারাও গিয়েছিলেন। কিন্তু তারা মুষ্টিমেয় কয়েকজন তাদের চেনাজানা ছেলে বেছে নিয়ে গেছেন। আমাদের পরিচয় পেয়েও অবহেলায় পাশ কাটিয়ে গেছেন। বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেয় তারা আমাদের জন্যে কোন ব্যবস্থা করলেন না।

তারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং ক্ষমতা লাভের বিভিন্ন অলিগলি খুঁজেই ব্যস্ত থাকতেন। তাদের মধ্যে চাঁদপুরের মিজানুর রহমান চৌধুরীও ছিলেন। স্বাধীনতার পর যিনি এ দেশটিতে বহু বড় বড় আসন অলংকৃত করেছিলেন। এমনকি তখনও তিনি চাঁদপুরের জন্যে উলেখ করার মতো তেমন কিছুই করেন নি। যদিও চাঁদপুরবাসী তাকে বার বারই নির্বাচিত করে সুযোগ দিয়েছেন। উপযুক্ত সম্মান দিয়েছেন। মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কি চাঁদপুরবাসীদের সে সম্মান-মর্যাদা রক্ষা করেছেন? এরা দেশ-জাতির জন্যে কখনও রাজনীতি করেননি। রাজনীতি করেছেন নিজের জন্যে। তাই নিজেকে নিয়েই সব সময় ব্যস্ত থেকেছেন। সবার বেলায় না হলেও অধিকাংশ রাজনীতি-খোর্‌দের বেলায় আমার এই একই কথা। যা আমি রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা ও চরম বাস্তবতা হতে অর্জন করেছি।

দেখতে দেখতে তিনটি মাস পার হয়ে গেল। আমাদের জন্যে কোন নতুন খবর নেই। ক্যাম্পের দু'তিনজন যুবক পাহাড়ী রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। তাতে আমাদের মানসিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। আমরা অস্থির হয়ে পড়লাম দেশে ফেরার জন্যে। ক্যাম্প চীফকে বার বার তাগাদা দিতে থাকলাম আমাদের জন্যে কিছু করার জন্যে। কেন না আমরা কেউই পাহাড়ী রোগের সাথে যুদ্ধ করে মরতে চাই না। যদি মরতেই হয় তবে দেশের জনগণের জন্যে কিছু করেই মরতে চাই। দেশকে স্বাধীন করতে চাই। দেশে গিয়ে নাপাক সেনাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাদের দু'চারটি এবং তাদের দালাল কিছু রাজাকারকে মেরে একটু শান্তি নিয়ে মরতে চাই।

পরে আমাদের ক্যাম্প চীফ সম্ভবত: ওনি ছিলেন সিলেটের দেওয়ান আবুল আব্বাস (তখনকার ছাত্রলীগের ছাত্র নেতা হবে হয়তো) কিছু দিন একটি গাদা রাইফেল দিয়ে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করলেন।

সাথে কোথাও হতে যেন ঝংধরা একটি স্টেনগান ব্যবস্থা করে তা চালানো এবং গ্রেনেড ছোড়াও শেখালেন।

একদিন সকালে আমাদের সেই ক্যাম্পচীফ এক্সারসাইজ ফিল্ডে বললেন- এবার তোমরা যদি কেহ দেশে ফিরে যেতে চাও, তা নিজ দায়িত্বে যেতে পার। তবে এভাবে তোমাদের দেশে ফেরত পাঠানো *হাই কমান্ড* থেকে কোন অর্ডার নেই।

তোমাদের মাঝে যারা দেশে ফিরে যেতে চাও। তারা সবাই দরখাস্ত জমা দাও। আমি *'হাই কমান্ড'* থেকে মঞ্জুর করিয়ে আনার চেষ্টা করবো। তবে একটি কথা মনে রেখ, তোমরা দেশে ফেরার সময় কোন হাতিয়ার পাবে না। কেননা আমাদের ষ্টকে কোন হাতিয়ারই নেই। দেশে গিয়ে আল বদর আর রাজাকারদের কাছ থেকে হাতিযার কেড়ে নিয়ে দেশের জন্যে কাজ করবে। এ ক্ষেত্রে একটা বিশেষ কথা জেনে নাও, দেশের ভেতরে মুক্তি বাহিনীরা নিজেদের স্বার্থে সেখানকার কিছু লোকদের বিশেষ ক্ষেত্রে রাজাকার বানিয়েছে। যারা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে কাজ করে যাচ্ছে অতি নীরবে। সাবধান! গরম মস্তিস্কে হঠাৎ করেই কোন সিদ্ধান্ত নিবে না......।।

দরখাস্ত জমা দিলাম। প্রায় প্রতিদিনই ক্যাম্প চীফ এর নিকট জানতে চাই। কী খবর। না। তিনি কোন খবর দিতে পারেন নি। অবশেষে প্রায় বারো তের দিন পরে খবর এলো আমরা যাবার জন্যে তৈরী হতে। ক্যাম্প চীফ আমাদের কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে বললেন-ঐ কাগজপত্র সাথে না থাকলে ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী তোমাদের আটক করবে। দেশে যেতে দেবে না। কেননা তারা ভাববে তোমরা গুপ্তচর। তিনি এও বলে দিলেন সীমান্ত পার হবার পর সে কাগজপত্র আর যেন সাথে না রাখি। কেননা বিভিন্ন জায়গায় পাক-রাজাকারদের চেকে ধরা পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু। - 'মনে রাখবে- তোমরা সাধারণ নাগরিক, দেশে ফিরে যাচ্ছো। চাষা-ভুষার বেশে কোন বুড়ো লোকের নাতি হিসেবে পথ চলবে। আপাতত: দেশের ভেতরে যারা আছে তাদের সহজে বিশ্বাস করবে না। তাই বলে দেশের ভেতরে যারা আছে, তারা সবাই কিন্তু পাকিস্তানের দালাল নয়। তবুও বুঝে-শুনেই পা বাড়াবে'। এটা আমার দায়িত্ব ছিলো তাই বলে দিলাম।

নিজেদের গোছগাছ করে নিচ্ছি দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে। এরি মাঝে ঘটে গেলো আর এক অনাকাঙ্খিত ঘটনা। ক্যাম্প গরম হয়ে উঠলো একটি বিশেষ খবরে। আর তা হলো একজন গুপ্তচর ধরা পড়েছে। যে নাকি আমাদের আশে-পাশের সকল ইয়থ ক্যাম্পের খবরা-খবর, লোকেশান, দুরত্ব সংগ্রহ করতে এসেছে পাক হানাদারদের জন্যে। আমাদের ক্যাম্পে আমার সাথে আরও দু'তিনজন চাঁদপুরের লোক ছিলেন। তাদের বললাম চলুন দেখে আসি গুপ্তচর দেখতে কেমন। তারা ক্লান্তি ও ভয় জড়ানো কন্ঠে বললো- গুপ্তচর দেখে কাজ নেই। তোমার সখ থাকলে নিজে গিয়ে দেখে এসো। কেউ যখন রাজী হয়নি, তখন আমার কৌতুহল মেটাতে নিজেই গেলাম।
গেইটে গিয়ে সেন্ট্রিকে বললাম- ভাই যে গুপ্তচরটি ধরা পড়েছে সে কোথায়?
সেন্ট্রি বললো- তাকে হাত-পা বেঁধে ঐতো সামনের ঘরটিতে ফেলে রাখা হয়েছে। কিন্তু তোমার অত জানার দরকার কি? যাও ব্যারাকে ফিরে যাও।

আমি তাকে মিনতি করে বললাম- আমার জীবনে এই শব্দটি বহুবার শোনেছি কিন্তু চোখে আজও দেখলাম না। আপনি দয়া করে একটু সুযোগ দিলে আমার কৌতুহলটা মেটাতে পারি।

সেন্ট্রি বললেন- কমান্ডারের অর্ডার বন্দীর সঙ্গে কাউকে দেখা করতে না দেয়া। ক্যাম্প চীফ কলিকাতা গিয়েছেন। কাল ওনি ফিরে আসবেন। ওনি আসলেই সিদ্ধান্ত হবে এই *স্পাই*কে কী করা যায়। ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তোমাকে কমান্ডারের অনুমতি আনতে হবে।

হঠাৎ কানে ভেসে এলো একটি নারী কণ্ঠ। যাতে কিছু কান্নার কাতরানি ভেসে এলো।
সেন্ট্রিকে জিজ্ঞেস করলাম- এখানে মেয়েলোকের কান্নার শব্দ শোনা গেলো মনে হচেছ।
সেন্ট্রি বললো- ওইতো সেই গুপ্তচর মহিলা। পাকিস্তানীদের গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে। তাকে আমরা কাগজপত্র সহকারে ধরেছি। পেয়েছি তার কাছে অনেক নকশা।
আবার অনুরোধ করলাম আমাকে পাঁচটি মিনিট সুযোগ দিন। আমি ওর সঙ্গে কোন কথা বলবো না। একটু দেখতে চাই পিজ ভাই একটু...।

সেন্ট্রির সাথে গত তিনমাসের পাহাড়ী ইয়থ ক্যাম্প জীবনে একটি ভালো হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিলো আমার। তবুও সেদিন সে এত কঠিন কেন ছিলো বুঝে উঠতে পারি না। আমার অবিরাম অনুরোধের কাছে শেষ পর্যন্ত সে রাজী হয়ে আমাকে নিয়ে সেই বন্দীশালায় ঢুকলো। প্রায় পাঁচ ফুট পাঁচ - ছয় ইঞ্চির লম্বা সুন্দরী পাতলা গড়নের এক মহিলা দেখে আমি থমকে গেলাম। তাহলে এদেরই বলে গুপ্তচর!? তার পড়নে প্যান্ট ও সার্ট, মাথায় চুলের বয়কাট। আমিতো রীতিমতো অবাক বিস্ময়ে দেখছি! আরও বিস্মিত হলাম যে, তার ভয়ভীতি এবং অনুশোচনা বা মুক্তি পাওয়ার কোন আকুতি তার চোখে মুখে বিন্দুমাত্র প্রকাশ পায়নি। কিছু কথা বলতে চাইলে সে প্রথমে অনর্গল উর্দুতে বললো পরে আবার ইংরেজীতেও বললো। আমি ইংরেজীতে দু'চারটি শব্দ বোঝলেও উর্দুতে সে কি বলেছিলো তার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝি না। ইংরেজী কথাগুলোর অর্থ যা বুঝলাম- সে আমাদের ক্যাম্পচীফ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে কোন কথা বলতে পছন্দ করে না।

সে ঘটনায় আমাদের ক্যাম্প থেকে *রিলিজ অর্ডার* পাওয়া যাচ্ছিলো না। যার জন্যে আমরা সমস্ত কাগজপত্র পাওয়া সত্ত্বেয় বেরুতে পারছিলাম না। পরে সে গুপ্তচর মহিলার কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো তা আর জানি না। কিন্তু তার একদিন পরই আমাদের সেই ইয়থ ক্যাম্পগুলোকে লক্ষ্য করে কুমিলার সীমান্তবর্তী কোন স্থান হতে মর্টার আক্রমন করেছিলো পাক- সেনারা। যাতে অনেক লোকজন হতাহত হয়েছিলো। এতে ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে পড়লো সবাই। আমরা আরো অস্থির হয়ে পড়লাম। কবে নাগাদ এ বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বদেশে গিয়ে কিছু কাজ করতে পারবো।

বেশ কিছুদিন হলো আমাদের এলাকা থেকে আসা এক লোকের মাধ্যমে বাড়ির খবর পেয়ে মনটি এমনিতেই বিষাদে ছেয়ে আছে। বিশেষ করে বড়ভাই নাকি কোথাও যুদ্ধে পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে। সে থেকে তার আর কোন খবর নেই। তাতে মা তো ধরেই নিয়েছে যে, পাকবাহিনী তাকে মেরে ফেলেছে। তারপর আমিও ভারতে এলাম প্রায় তিনমাস। ভেবেছি এলেই মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং নিয়ে নিজ এলাকায় গিয়ে কিছু একটা করবো। সে চিন্তায়ও ছেদ পড়লো। হাতিয়ার নেই বলে। দেশেও কোন খবর পাঠাতে পারছি না যে - 'আমি বেঁচে আছি এবং ভালো আছি'। তাহলে খামোখাই ভারতের পাহাড়ে পড়ে থেকে অস্বাস্থ্যকর খানা খেয়ে ধুঁকে ধুকে মরার কোন অর্থ খুঁজে পাই না। এক একটি দিন যেন এক একটি যুগ।
অবশেষে যেদিন ছাড়া পেলাম। তখন সময় বিকেল প্রায় সাড়ে তিনটা। ১১ / ১২ জনের একটি গ্রুপ নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পকেটে আছে শুধু একপ্যাকেট টেন্ডু পাতার গনেশ বিড়ি এবং একটি মেচ। আর দুই টাকা এগার আনা। সেই মাস তিনেক পুর্বে ভারতে আসার সময় মা তাঁর আঁচলের গিঁট খুলে যা দিয়েছিলেন তার থেকে এখনও এই পয়সাগুলো টিকে আছে আমার কাছে। বলা যায় বিদেশ মানে ভারত

থেকে নিজ দেশে রওয়ানা দেবার সময় আমার কাছে ঠিক ঐ পয়সাগুলোই ছিলো। যা এখনকার সময়ে সবার কাছেই হাস্যস্পদ মনে হতে পারে।

বিড়ির কথা এজন্যেই বললাম, তখন পাহাড়ী ক্যাম্পের চরম শীতে সহপাঠীদের বিড়ি টানা দেখে দেখে এবং তারা মাঝে মধ্যে দু'চারটা টান দিতে দিলে তাতে বেশ মজা পেতাম। আর সে থেকেই ধুম পান শিখে ফেললাম। যে বাজে অভ্যেসটা আর ছাড়তে পারি নি।

ভারতের অংশে বাসে কিংবা ট্রামে যে যান-বাহনেই উঠেছি তারা যখন জেনেছে আমরা জয় বাংলার মানুষ এবং ট্রেনিং শেষে দেশে ফিরছি। তারা কেউ আমাদের কাছে কোন ভাড়া নেয়নি। এমনি সুযোগ-সুবিধা সর্বত্রই পেয়েছি। ভারতের যেখানেই গিয়েছি সেখানকার জনগণের আন্তরিক সহযোগিতার কথা আমি কখনোই ভুলবো না। বিশেষ করে তাঁদের সরকার আমাদের যে এককোটিরও অধিক লোককে তাদের দেশে প্রবেশের সুযোগ দিয়ে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। তাদের দেশে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছেন। সর্বাত্মকভাবে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছেন। যার ফসল আমাদের এই স্বাধীনতা। তাঁদের সেই উদারতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের কোন দ্বিধাদ্বন্ধ থাকা উচিত নয়। অন্তত: যারা সঠিক ইতিহাস জানি।

অবশেষে সাত আট দিনের পায়ে হাটায় চাঁদপুর জেলার সীমানার মধ্যে এসে পৌঁছি। এখানে এসে দেখলাম পায়ে পায়েই বিপদ। প্রথমেই চিন্তা মায়ের সাথে দেখা করা। তারপর শুরু করবো দেশের জন্যে কাজ। কেন না ভারতে থাকতেই জেনেছি মায়ের অবস্থা খুবই খারাপ। তিন ছেলের দুই ছেলেই লাপাত্তা। সে মা ঠিক থাকে কীভাবে! বার বারই আমার লেখায় শুধু মায়ের নামই আসে। পিতার নাম কেন আসছে না। এ প্রশ্ন জাগতে পারে সুপ্রিয় পাঠক মনে। কেননা আমি এতিম হয়েছি সেই শৈশবেই। যখন মা আরো জেনেছেন আমাদের গ্রুপের শেষ হয়ে যাবার খবর। আমাদের এলাকার আরো কয়েকজন কিশোর যুবক গিয়েছিল সে সময় ভারতের বর্ডার পার হতে আমাদের সঙ্গেই। বর্ডারের গোলাগুলী উপেক্ষা করে আমরা পার হয়ে গেলেও তারা পেছন থেকে পালিয়ে ফিরে এসেছে। এবং এলাকায় ফিরে এসে আমার মাকে জানিয়েছিলো যে, হয়তো আমি বা আমাদের গ্রুপে যারাই ছিলো তারা সম্ভবত: সবাই শেষ। আর তেমন খবরে মায়ের মনে যে সময়ের সাড়াশী চেপে ধরেছে। তাতেই ওনার শারিরীক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে।

সীমান্ত পার হবার সময় আমাদের পেছন থেকে পালিয়ে আসা সেই কিশোর-যুবকরা পরে কেউ কেউ রাজাকার এবং ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সেজে অনেক অঘটনের নায়ক হয়েছে। স্বাধীনতার পরে কোত্থেকে যেন সেই তারাই মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে অত্যন্ত তড়ি-ঘড়ি। আর হাতিয়ে নিয়েছে তখনকার ব্যাপক সুবিধা। কেউতো একেবারে রাতারাতি হাতিতে পরিণত হয়েছে! আমি বা আমার মতো গো-বেচারা কিশোর মুক্তিযোদ্ধারা হাতিয়ার ফেলে যখন শিক্ষাঙ্গনে বই-খাতা নিয়ে ঘুরছি। তখনও সেই পেছনের পালিয়ে আসা কাপুরুষগুলো হাতিয়ার নিয়ে বিভিন্ন কলংকের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। টাকা কামানো এবং ভুয়া সার্টিফিকেট সংগ্রহে তারা ছিলো মহাব্যস্ত। সময়ে তারাই হয়ে যায় সমাজের, দেশের কর্তাব্যক্তি। বড় বড় নেতা ও মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ (!?) হায়! দুর্ভাগা বাংলাদেশ ও তার দুর্ভাগা জনগণ। যার ফসল দেশটা স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পরও আকণ্ঠ দুর্ভোগে ডুবে আছে।

চাঁদপুর এলাকায় পৌঁছে যে যার গন্তব্যের উদ্দেশে চলে গেলো। কোন কথা হলো না আবার কোথায় আমরা মিলিত হবো এবং তা কবে। এ সবের দরকারও ছিলো না। কেননা ভারত থেকে বেরুবার সময়ই আমরা জেনে এসেছি, ভারত সহসাই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সরাসরি সাহায্য করবে। আমাদের

দেশটাকে ‘ডিকলারেশান’ দেবে। অতএব সহসাই আমাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত। এখন ভাবনা শুধু যেভাবে পারি দেশের জন্যে কিছু কাজ করা। পথে পথেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কীভাবে কাজ করবো। যেহেতু আমরা ছোট্ট কিশোর তাই মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করবো বিভিন্নভাবে।

চাঁদপুরের বাবুর হাট এলাকা পার হতে হবে মেইন রোড ধরে। তাতে আবার একটি ব্রিজ রয়েছে। যেখানে রয়েছে রাজাকার ও পাকসেনাদের ক্যাম্প। অতএব সে পথে পার হওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এক বৃদ্ধলোকের সঙ্গে কথা বললাম। তাকে বিশ্বাস হয়ে গেলো। তাই তাকে অনুরোধ করে বললাম- চাচা আমরা এ রাস্তা দিয়েই আমাদের গ্রামে যাবো। বিকল্প কোন পথ নেই। আমরা ভারত থেকে এসেছি। আপনি কি আমাদের সাথে নিয়ে যেতে পারেন?

কেননা শোনেছি পথে একটি ব্রিজ আছে এবং সেখানে পাকবাহিনীর ক্যাম্প আছে সঙ্গে রাজাকারও। আমাদের সাথে কোন হাতিয়ার নেই। আমরা দু’জই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। তাই তারা কিছু জিজ্ঞেস করলে আপনি বলবেন যে- এরা দু’জনই আমার ছেলে। এরা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াতে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।

তিনি বললেন - বাজান এইডা বড়ই বিপদের কাম। তবুও চলো। শুধু আলাহর উপরই ভরশা কর। আমরা সেই চাচার সঙ্গে কথিত ব্রিজটি পার হতে পা বাড়াই। তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে পাকিস্তানি সেনারা আমাদের দাঁড় করিয়ে কি যেন উর্দুতে জিজ্ঞেস করলো তার কিছুই বুঝি না। আমাদের গাইডার সেই চাচা ওদের বললেন-এ দুইটা হামারা লারকা আছে। হাসপাতাল মে লেকে যাতা হ্যায়। ওদের রোগ-বিমার আছে।

ব্যস! চাচার সেই বাংলা মিশ্রিত উর্দুতেই কাজ হলো। অন্যদিকে এই পথে চাচা সবসময়ই চলাচল করেন বলে পাকিস্তানী সেনারা তাকে চিনে-জানে এবং বিশ্বাস করে। কিন্তু তাদের সঙ্গের দু’জন রাজাকার এসে বললো- চাচা আমাদের সন্দেহ হয়, এরা তোমার ছেলে কিনা। আমাদের মনে হয় ওই সাহা বাড়ির ছেলে এরা। যাদের বাড়িটি আমরা এ দু’জনে দখল নিতে যাচ্ছি দু’চার দিনের মধ্যেই। আজ তুমি তাদের পার করে দিচ্ছ ছেলে বলে....। ওকে ! ওরা যদি মুসলমান হয় তাতে তোমার কথাই আমরা মেনে নেব। নতুবা এখনই গুলি করে ব্রিজের নিছে ফেলবো। আমরা আমাদের এই পবিত্র পাকিস্তানে কোন কাফেরকেই রাখবো না।

তখন আমাদের দু’জন কিশোরের অবস্থা শ্বাস বন্ধ হবার মতো । ওদিকে পাকসেনাটি রাজাকার দু’জনের উদ্দেশে বলছে - বাইনসোত্ বুড্ডা বেচারাকো কিও খামোখা তাং কররাহাহো? ওছ্কো ছোড়দে...যানে দে......। কিন্তু রাজাকার দু’জন নোছোড় বান্দা। সে দু’জন রাজাকারকেই আমি মোটামুটি জানি। ভাগ্যিস সেদিন ওরা আমাকে চিনতে পারেনি। পারলে নির্ঘাত ওদের গাদা রাইফেলের গুলিতে আমাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতো। এখানেও জীবনটা আবার বোনাস হিসেবে পেলাম। রাজাকারদের একজন চান্দ্রা বাজার এলাকার এক হাই স্কুল শিক্ষকের ছেলে সালেহ আহমদ। তার বাপ উত্তর বঙ্গের কোন একটি জেলায় এক হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নাকি উপ-প্রধান হিসেবে আছে জানি।

ভাবছি একজন আদর্শবাদী শিক্ষকের ছেলে আজ রাজাকার বা পাকিস্তানের দালাল?! কীভাবে তা সম্ভব হলো!? জেনেছি এলাকার মধ্যে সেই সালেহ রাজাকার সবচে’ বেশী অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। যার জন্য তাকে দেখার পর থেকে আমি নিজেও খুব *‘নার্ভাস ফিল’* করছিলাম। সে আমাদের কাপড় খুলে পুরুষাঙ্গ দেখাতে বলে। পুরষাঙ্গ দেখেই সে নিরূপন করবে আমরা কাফের না মুসলমান।

হায় খোদা! এবার বাঁচতে হলে পুরুষাঙ্গ দেখাতেই হবে। সেখানে আমাদের কোন পছন্দ নেই। অগত্যা কাপড় খুলে দেখাতেই হলো। ওরা দু'জনই বেশ মজার হাসি হাসলো বলে মনে হলো। পরে তারা আমাদের সঙ্গের সেই বুড়ো চাচাকে বললো - যাও চাচা তোমারা দুই বেটাকো লিয়ে যাও.......।।

সেই দু'জন রাজাকারের একজন সালেহ আহমেদ। ডিসেম্বরের (১৯৭১) প্রথম সপ্তাহ থেকে তাকে বহু খুঁজেছি। কিন্তু তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারপর যখন যুদ্ধ শেষে হাতিয়ার ফেলে বই-খাতা হাতে তুলে নিই। শিক্ষার রেলিং ঘুরে ঘুরে একদিন নিজেও কর্মজীবনে প্রবেশ করি। তখন একদিন বাই দ্যা বাই জানতে পারি, সেই সালেহ আহমেদ দেশ স্বাধীন হবার পূর্বেই চাঁদপুর ছেড়েছে।

ঢাকায় নাকি উত্তর বঙ্গের কোন স্থান থেকে পড়াশোনা করেছে। তখনকার বাংলাদেশ সরকারের কোন বিশেষ বিভাগে চাকুরীও করেছে। তারপর সময়-সুযোগ নিয়ে মানে দলীয় ক্যাডার হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে সুযোগ পেয়ে সে চলে গিয়েছে। তবে জেনেছি ঢাকায় বুদ্ধিজীবি নিধনে কুখ্যাত ক্যাডারদের মধ্যে সে খুবই দক্ষ এবং অগ্রগামী ছিলো।

দলের বিশ্বস্থ একজন হতে পেরেছিলো বিধায় বিনা খরচে মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার সুযোগ পায়। বিদেশ গিয়েও নাকি জামাতের রাজনীতিতে সংশিষ্ট। প্রবাসে বাঙালি কমিউনিটির একজন পাতিনেতা হতে পেরেছে। জামাতে ইসলাম ওরফে পলিটিক্যাল ইসলাম এর জন্যে সে এক অনন্য নিবেদিত কর্মী।

চাঁদপুর মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে চাঁদপুরের চর এলাকার কুখ্যাত চোর ***আইল্যা চোরা*** কে খুঁজে বের করে মুক্তিবাহিনীর লোকেরা আটক করে।। কেন না মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস সে আল-সামস বাহিনীতে যোগ দিয়ে নিরিহ লোকের উপর অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়েছিলো। তাকে চাঁদপুর থানার সামনে ছাগলের দড়ি দিয়ে বেঁধে টাঙ্গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণ মিলে পিটিয়ে পিটিয়ে মারতে থাকে। এবং চাঁদপুরের আর এক ব্যবসায়ী শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান লতিফ খন্দকারকে যখন আমাদের চাঁদপুরের শহরবাসী এবং মুক্তিযোদ্ধারা তার শাস্তি হিসেবে চাঁদপুর টাউন হলের ছাদ থেকে লাথি মেরে নিচে ফেলে দিয়েছিলো লাখো জনতার সামনে। সেই সালেহ আহমেদকে পাওয়া গেলে আমিও সেই একই ব্যবস্থা নিতাম। তার ভাগ্য ভালো ছিলো নির্দ্বিধায় বলা যায়। তবে আমি মনে করি এখন আবার সময় এসেছে সেই কুখ্যাত ক্যাডারকে খুঁজে বের করার। এখন যারা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়নের কথা বলেন, তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা সজাগ। এই সেই তারা যারা বাংলাদেশের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে খুঁজে বের করে মুক্তিযোদ্ধা মুক্ত বাংলাদেশ বানাতে চান। কিন্তু আমরা সচেতন জনগণ চাই রাজাকার মুক্ত বাংলাদেশ। তাই আজ বিশেষ জরুরী রাজাকারদের তালিকা প্রণয়ন।

সেই মহাবিপদসঙ্কুল ব্রিজ পার হতে পেরে মনে হয়েছিলো যেন পুলছেরাতই পার হয়ে এলাম। কেননা তখনকার দিনে এই সকল ব্রিজের পাশে থাকতো পাক-রাজাকার ক্যাম্প। এই পাক-রাজাকাররা তখন কত নিরীহ বাঙালিকে যে খামোখাই গুলি করে ফেলে দিতো এই সকল ব্রিজের নিচে। তার কোন ইয়ত্তা নেই। হায়! বাঙলার সেই নিদারুণ কলংকিত এবং কলুষিত সময়!!

আমাদের গাইডার চাচা ব্রিজ পার হতেই পাশের বাবুরহাট বাজারে আমাদের নিয়ে যান। বাজারে গিয়ে একটি ভাঙ্গাচোরা রেস্টুরেন্টে ঢুকেই বিচি কলা এবং মুড়ি কিনে দিয়ে বললেন- খাও বাবারা। কানের কাছে একটু ঝুকে এসে তিনি বললেন - তোমাদের মুখ দেখে মনে হয় দু'তিন দিন কিছুই খাওনি। সত্যিতো গত দু'দিন কিছুই খেতে পাই না। সামনে যা পেলাম গোগ্রাসে তা গিলে পানি খেলাম। মনে

হলো আবার প্রাণশক্তি ফিরে পেলাম। সেই বিচি কলা আর মুড়ি আমাদের কাছে মনে হয়েছিলো যেন অমৃত। ফিরে পেলাম আবার কেরোশিন শিখার মতো নিভু নিভু প্রাণটি।

এবার চাচা আস্তে আস্তে বলতে থাকলেন- আমার একমাত্র ছেলে রহমত মুক্তি বাহিনীতে গিয়েছিলো। একটি অপারেশানে গিয়ে গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যায়।

সে থেকেই তোমাদের মত কাউকে পেলে নিজের ছেলেই মনে হয়। তাই জীবন দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করি। কথাগুলো বলতে বলতে চাচা কেঁদে ফেললেন। বাবা আমি একজন সাধারণ ফ্রি স্কুল মাষ্টার। তোমাদের কোন ধরনের সাহায্য লাগলে আমারে খবর দিও। আমি জান দিয়ে তোমাদের সাহায্য করার চেষ্টা করবো। কেন না আমার ছেলে শহীদ হবার পর আমি মনে করি সমস্ত মুক্তিবাহিনীর ছেলেরাই আমার ছেলে। বলার অপেক্ষা রাখে না এমন পিতাদের সাহায্যেই সেদিনের মুক্তিযুদ্ধ পেয়েছিলো সীমাহীন গতিশীলতা।

অবশেষে পৌঁছলাম বাড়ি। মায়ের মুমুর্ষ অবস্থা দেখে একেবারেই ঘাবড়ে যাই। আমাকে পাওয়ার পর মা আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠেন। মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের খোঁজে বেরুলাম। বহু দুরের গ্রামে গিয়ে পেলাম সে খোঁজ। তাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে লাগলাম। তাতে মনে কিছুটা তৃপ্তি পেলাম।

অন্তত: কিছু করতে পারছি দেশের জন্যে এটাই শান্তনা। কাছাকাছি আছি বিধায় মাকে মাঝে মধ্যে রাতে এসে দেখে যাই। মা যে এলাকায় ছিলেন মানে যে আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলেন সেখানে কখনই পাক সেনারা যেতে সাহস পায় না। দু'তিন বার তারা নদী পথে এলেও আর ফিরে যেতে পারেনি। মুক্তিবাহিনীর ক্যাচ্কি মাইরে অনেকেরই সলিল সমাধি হয়েছে। তাই ঐ এলাকাটি সব সময়ই মুক্ত ছিলো। বলা যায় মুক্তি বাহিনীর জন্যে সে এলাকাটি ছিলো নিরাপদে চলাচলের একটি বিশেষ এলাকা।
একদিন একটি ছালার ব্যাগে চার / পাঁচটি গ্রেনেড দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছিলো অন্য ক্যাম্পে পৌঁছে দিতে। আমি দু'কেজি চাউল (পেট মোটা টেপি চাউল তখন ছিলো প্রতি সের বার আনা)। এর সাথে দুই হালি হাসের ডিম নিয়ে সব কিছুর নিচে রাখি গ্রেনেড। রেললাইন ধরেই যেতে হবে বিকল্প কোন রাস্তা নেই। অথচ আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে পৌঁছার পুর্বেই একটি রেললাইনের পুল বা ব্রিজ রয়েছে। আর তখনকার রেললাইনের পুল বা ব্রিজ মানেই পাকসেনা আর রাজাকারের ক্যাম্প।

এক অসমসাহসী যুবকের মতো বুক টান করে হাটতে থাকলাম। পুলের কাছে পৌঁছলে একজন রাজাকার চিৎকার করে ***হোল্ড*** বলে আমাকে থামালো। এবং আমার ব্যাগ চেক্ করতে চাইলো। পাকসেনারা তখন আমাদের দেশীয় মদের বোতল টানছিলো বলেই মনে হলো। তারা ইশারা দিলো তাকে। মনে হলো যেন বলছে.. গুলি করে ফেলে দাও...মুক্তি হোগা..ও.....। সে ইচ্ছে করলে তা করতেও পারতো। রাজাকারটি আমার পরিচিত ছিলো। এবং আমাদের ইনফরমারের কাজও করতো।

রাজাকারটি বুঝতে পেরেছে এবং নিশ্চিত হয়েছে যে আমার ব্যাগে কী আছে।..তবুও সে পাকসেনাদের বললো..ওস্তাদ ব্যাগমে কুছ বি নেহি হ্যায়..যো হ্যায় ও খানেকা চাল আওর আন্ডা হ্যায়। সে ব্যাগ থেকে একটি ডিম উঠায়ে দেখালো পাকসেনাদের। তারপর আমাকে বললো- তাড়াতাড়ি ভাগো, কাইট্টা পড়ো। এ রাস্তায় আর কখনো আইবা না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই রাজাকার কাউসার নিজ এলাকাতেই আজও বেঁচে আছে এবং সৎভাবেই জীবনযাপন করছে।

স্মৃতির উপর চাপ প্রয়োগ করে করে এ মাঝ বয়সে এসে আজ যখন একাত্তরের স্মৃতির জাবর কাটছি তখন সেই দিপালী এবং জোবেদার করুণ মুখখানি আমার সামনে বার বার ভেসে উঠছে। জোবেদা সবেমাত্র দশম শ্রেণীর ছাত্রী। স্থানীয় একটি হাই স্কুলে অধ্যয়নরত। তার পিতা মোড়ল গোছের মানুষ। গাঁও-গেরামে বিচার আচার করে। মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত পরিবার বলে এলাকার লোকজনও বেশ সমীহ করে। কিন্তু পাকবাহিনীরা এলাকায় এলে সে যোগ দিল শান্তি কমিটিতে। সে এলাকার শান্তি চায়, দেশের শান্তি চায়, জনগনেরও শান্তি চায়। বিপত্নীক এ জমির আলী সময়ে অসময়ে দু'একদিনের জন্যে কোথায় কোথায় হারিয়ে যেত তা কেউ জানে না। সে এক রহস্যজনক ব্যাপার।

পাকসেনাদের নিয়মিত মেয়ে-মহিলা সাপ্লাইয়ার এক রাজাকার জোবেদাকে স্কুল থেকে যেতে দেখে তার পিছু নেয়। সে জানতে চায় মেয়েটি কোন বাড়ির। শেষে পাকসেনাদের জানায়। জমির আলি বাড়ি নেই । সেই রাজাকার দু'জন পাকসেনা নিয়ে সেই শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান জমির আলির বাড়িতে গিয়ে হানা দেয়। তবে তারা জানতো কিনা জানি না এটাই তাদের পদলেহী চাটুকার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের বাড়ি। তারা জোবেদাকে ধরে নিয়ে যায় ক্যাম্পে। দিনভর তারা জোবেদার উপর যৌন অত্যাচার চালায়।

বিকেলের দিকে তারা জানতে পারে এ মেয়েটি তাদেরই পদলেহি চাটুকার জমির আলির মেয়ে। তখন তারা তাকে প্রায় মুমূর্ষ অবস্থায় বাড়ি পৌছে দেয়। জমির আলি রাতে বাড়ি এলে জানতে পারে ঘটনা। সে দৌড়ে যায় সেই পাক বাহিনীর ক্যাম্পে। পাকসেনা আর রাজাকাররা তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে। পাকসেনারা পাকিস্তানী মওদুদী টাইপে জমির আলিকে বয়ান করে শোনায়...

জঙ্গা কি ময়দান মে এ সব কুছ জায়েজ হ্যায়। সবকুছ হালাল হ্যায়। তোমারা লাড়কীকো ছমজাও। আওর যেত্না পাইসা চাইয়ে লেকে যাও, ওছকো এলাজ করাও। মগার এক বাত হ্যায় ইয়ার তোমতো কভি তোমারা ঘরপে হাম লোগকো দাওয়াত দিয়াই নেহি। হাম লোগোকো ক্যায়ছে পাত্তা চলেগা ও তোমারা লাড়কী হ্যায়। যো ভি হুয়া ওছকো ভুল যাও। ওছকো এলাজ দেকার আচ্ছা কর। ফের কভি কভি ওছকো ভেজ দাও হামারা পাছ দু' এক ঘন্টাকি লিয়ে। তোমকো মালামাল কর দিউঙ্গা। এরিয়াকা রইস বানা দেউঙ্গা...। তোম্ ছোচ বি নেহি চাকোগে হাম লোগ তোমারি লিয়ে কিয়া কিয়া কর ছাকতাহে....।।

জমির আলি একটি টাকার বান্ডেল হাতে নিয়ে বাড়ি চলে আসে। মেয়ের জন্যে ডাক্তার আনে। তার চিকিৎসা করায়। দিনে দিনে তাকে সুস্থ করে তোলে। কিন্তু পাকিস্তানী সেনাদের শিখিয়ে দেয়া সেই মহৎ (!?) বাণীগুলো সে সবই মেয়ের কাছে বয়ান করেছে। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তেই মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু জোবেদা কোন কথা বলে না । সারাদিন শুধু একাকী বসে থাকে আর কি যেন ভাবে। চোখের পানি ফেলে। জোবেদার সদা হাস্যোজ্জল মুখে যেন আষাঢ়ের কৃষ্ণ কালো মেঘ স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে।

একদিন মুক্তিবাহিনীর জন্য গোয়েন্দাগিরি করতে বেরিয়েছি। ফসলি জমির আঁকা-বাঁকা আল ধরে হাটছিলাম। পাশের একটি আখ ক্ষেত থেকে একটি আখ নিয়ে চিবুতে চিবুতে পথ চলতে থাকি। চলতে চলতে জোবেদাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভরা ভাদরের মতো তারুণ্যে পূর্ণ এক ছটপটে প্রজাপতি মেয়ে। অথচ বিমর্ষ বদনের মেয়েটিকে এমনি অবস্থায় বাড়ির বাটে বসে থাকতে বহুবার দেখেছি। সেদিনও দেখছিলাম। সেও আমার দিকে বার বার কেমন যেন করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো। সেদিন ভরসন্ধ্যে সে পথে দিয়েই যখন যাচ্ছিলাম। মেয়েটি আমাকে ডাক দিয়ে বসলো। এই যে ভাই, তুমি কি আমার একটু কথা শোনবে...।?

আমি জানি এটা শান্তি কমিটির চেয়াম্যানের বাড়ি। এ মেয়ে নিশ্চয়ই তারই হবে। দেখতে বেশ মিষ্টি মেয়ে। সুন্দর গড়ন। অথচ তার চোখেমুখে বিষাদের ছায়া। এ বয়সের মেয়েরা হবে চঞ্চল এবং সব সময় থাকবে হাসিখুশি। অথচ এ মেয়ে যেন ভাবলেশহীন...। আমি তাকে দেখে সব সময়ই এসব ভাবতাম। মনে হয়েছে তার জীবনের উপর দিয়ে কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। যা আমি একটু চেষ্টা করলে বা অগ্রসর হলে জানতে পারবো। আমার মতো সে বয়সে তেমন আগ্রহ, বাঁধ-ভাঙ্গা নদীর মতো আবেগ সবার মাঝেই প্রবাহিত হয়। যা আমার মাঝেও ছিলো।

সেদিন সে মেয়েটির ডাকে সাড়া দিয়ে আমি সানন্দে এগিয়ে গেলাম। একটি মেয়ে ডেকেছে বিধায় সেদিন নিজে মনে মনে যেমন আনন্দিত তেমনি গর্ববোধ করছিলাম। কেননা নিজের বোন ছাড়া ওভাবে কেহ কোন দিন ডাকেনি কিনা তাই। মনের মুকুরগুলো লজ্জাবতীলতার মতো যেন নুয়ে আসছিলো। আমার সেই লজ্জাবনত: মুহূর্তে সে বললো- তুমি কি জানো মুক্তি বাহিনীর ক্যাম্প কোথায় আছে। যদি জানো আমাকে নিয়ে যাও। আমি মুক্তি বাহিনীতে যোগ দেবো। দেশের জন্যে যুদ্ধ করবো। যুদ্ধ করে মরবো। ঐ বাজারের ক্যাম্পটিতে যতগুলো নাপাক কুত্তা আছে তাদের মারবো। এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলতে গিয়ে মেয়েটি হাফাতে থাকে। অবশেষে সে কেঁদে ফেললো। চোখে তার শ্রাবণের বর্ষণ।

মেয়েটির সে কথা শোনে আমার মনে হলো এ মেয়ে নিশ্চয়ই কোন বাহানা করছে না। কিংবা কোন ফন্দিও আঁটছেনা যে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প খুঁজে পেলে সে খবর পাইক্যাদের কাছে পৌঁছে দেবে। অনেক্ষণ ভাবার পর অবশেষে তাকে নিয়ে গেলাম আমাদের ক্যাম্পে। আমাদের কমান্ডারতো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো সেই জোবেদা নামের মেয়েটিকে আমার সঙ্গে দেখে। কমান্ডার বলছে- এ মেয়ে একজন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান এর মেয়ে। নিশ্চয়ই কোন ফন্দি নিয়ে এখানে এসেছে।

পরিবেশটি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে দেখে আমি প্রাণপনে অনেক বুঝানোর পর এবং জোবেদাও তার দুর্বিসহ কাহিনী বর্ণনা করলে তাতে সবারই দয়া হয়। কমান্ডার একটি টেন্ডুপাতার বিড়ি টানতে টানতে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন- ঠিক আছে তাহলে এখন থেকেই কাজে লেগে যাও। ভালোভাবে শিখে নাও শত্রুদের কীভাবে ঘায়েল করতে হবে। সে থেকেই জোবেদা আমাদের সঙ্গে কাজ করছে। জোবেদা হয়ে গেলো আমার সহযোদ্ধা, সহকর্মী এবং দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা শোনার সাথী। তবে সে থাকতো অধিকাংশ সময়ই বিমর্ষ। তার চেহারায় ফুটে উঠতো সময়ে সময়ে চরম প্রতিশোধের নেশা!

পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা সেই ক্যাম্পটি আক্রমনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। জোবেদা কাউকে না বলেই সে তার বাপকে একদিন হত্যা করে বসলো। তাতে তার প্রতি আমাদের বিশ্বাস বেশ পাকাপোক্ত হলো বটে; তবে ওই ঘটনার পর সে এলাকা আমাদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়লো। তাইতো দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া হলো পাক-রাজাকার ক্যাম্পটি আক্রমন করার পরপরই আমরা সে স্থান ত্যাগ করবো। পরিকল্পনা অনুসারে আমরা জোবেদাকে ক্যাম্পে আগে পাঠালাম। তাকে বলেছিলাম- ঠিক একঘন্টা পর আমরা কুকিল ডাকের আওয়াজ দেবো। আওয়াজ পেলেই তুমি জরুরী বাথরুমের কথা বলে ক্যাম্প থেকে সরে আসবে।

কিন্তু না। সে তা করেনি। জোবেদা সেই ক্যাম্পে পৌঁছেই রাজাকারদের সাথে কী সব কথা বলেছে। রাজাকাররা তাকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। কেননা তার বাপকে দু'দিন আগেই কে বা কারা মেরেছে। সেই জাতীয় কোন খবর নিয়ে কিংবা কোন সাহায্যের জন্যেও সে এ ক্যাম্পে যায়নি। এমন অসময়ে জোবেদার সেই ক্যাম্পে যাওয়া মানে অন্য কোন মতলব আছে এমন সন্দেহের কারণে

রাজাকারেরা জোবেদাকে ভিতরে ঢুকতে অনুমতি দেয়নি। তবুও সেই জেদী মেয়ে জোবেদা জোর করে ক্যাম্পে ঢুকেই দেখতে পায় দু'টি পাকসেনা একজন মহিলাকে জবরদস্তি ধর্ষন করছে। তার মাথায় আগুন চেপে যায়। ঠিক তক্ষুণি তাকে দেয়া পিস্তল থেকে গুলি করে দু'জন পাক সেনা মেরে ফেললো। আর অমনি রাজাকাররা তাকে গুলি করে ফেলে দেয়।

আমরা অপ্রস্তুত অবস্থায় গুলির আওয়াজ পেয়ে গোলাগুলি শুরু করে আধাঘন্টার মধ্যেই বুঝতে পারলাম জোবেদা হয়তো আর নেই। ক্যাম্পেরও সব খতম। আমরা চারদিক থেকে আক্রমন করেছিলাম। অতএব তাদের পালিয়ে যাবার কোন রাস্তাই ছিলো না। পরে আমরা বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ জোবেদাকে উদ্ধার করি গুলীবিদ্ধ মুমুর্ষ অবস্থায়। ক্ষীণ কণ্ঠে সে ঘটনা বর্ণনা করে। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই সে মারা যায়। সম্মানের সহিত তাকে তার বাড়ির আঙ্গিনাতেই দাপনের ব্যবস্থা করি। প্রায় দু'যুগের মতো দূর প্রবাসে থেকেও সেই শহীদ জোবেদাকে স্মরণের মাঝপথে কখনও ঘাস বিচালীর জন্ম হতে দেইনি। কেন জানি তার স্মৃতি আমাকে বার বারই বেশী বেশী ভারাক্রান্ত করে।

আজ এতো বছর পরে সেই জোবেদাকে স্মরণ করে চোখে জল আসে। হায়! জোবেদা তোমার ইতিহাস কেউ জানে না। কেউ লেখে না। ভালোই হয়েছে। ডাষ্টবিনের দুর্গন্ধযুক্ত বর্তমানের ইতিহাস থেকে তুমি মুক্ত আছো। তোমার মতো হাজারো জোবেদাদের কথা কেউ বলবে না। কেউ জানবে না। কেউ লেখবে না। তাতে কী। তোমরাই প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা, প্রকৃত দেশপ্রেমী। এদেশের মাটি ও মানুষেরাই তোমাদের চিরদিন স্মরণ করবে। তোমাদের স্মৃতির আতর-গোলাপ সুগন্ধই আমাদেরকে আমাদের অতীত ঐতিহ্য, প্রকৃত ইতিহাস মনে করিয়ে দেবে। আর ঘৃণা করতে প্রেরণা যোগাবে আজকাল যারা তোমাদের সেই মহান ত্যাগকে অস্বীকার করছে। জোবেদা তোমার সেই ধর্ষকরাই আজ নতুনভাবে ইতিহাসকে ধর্ষণ করে করে তার বিকৃতি ঘটাচ্ছে। তোমাদের অবদানকে খাটো করছে। তোমাদের সকল স্মৃতি মুছে ফেলার পায়তারা করছে। এতো লজ্জা আর কষ্টগুলো রাখি কই?

একাত্তরের আর একটি ঘটনা যা আমাকে আজো অপরাধী বানায়, কাঁদায়। সে ঘটনার সেই অসহনীয় দৃশ্য মনে হলেই যন্ত্রণায় শরবিদ্ধ পাখির মতো ছটপট করতে থাকি। একদিন বিকেলে গিয়েছি চুপিচুপি মাকে দেখতে। খুব সখ হলো ডাকাতিয়া নদীতে একটু ডুবিয়ে গোসল করবো। নদীতে তখন পানি পাড় থেকে দু'তিন হাত নিচে। নদী ভরা কচুরীপানা। একটি গামছা নিয়ে গেলাম নদীতে। পরম তৃপ্তিতে ডুবিয়ে গোসল করছি কচুরিপানা সরিয়ে সরিয়ে। এমন একটি সুযোগ এসেছে অনেকদিন পর। শেষ ডুবটি দিয়ে যখন মাথা উপরে উঠাতে যাই, ঠিক তখনি মাথায় একটি যুবতির লাশ ঠেকে। আমি ভড়কে যাই। মনে হলো ষোল আঠারো বছর বয়সের মেয়েটি। তরতাজা লাশ। আমার মনে হয়েছে মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেই ঘটনাটি ঘটিয়েছে পাক বাহিনী কিংবা রাজাকাররা। তাদের সন্দেহ করার সঙ্গত কারণও ছিলো। তখনকার ওই সকল জঘন্য এবং গর্হিত কাজগুলো একমাত্র তারাই করতো। লাশটি একটু ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করি। হয়তো আমাদের কোন আত্মীয়ও হতে পারে সে ভেবে। মেয়েটির গালে-ঠোঁটে-বুকে মানুষরূপী কুকুরের কামড়ের দাগ আমাকে বলে দেয় মেয়েটির উপর দানবেরা কী তীব্র যৌন অত্যাচার চালিয়ে চালিয়ে মেরেছে।

হায়! '৭১ এর সেই দিনগুলোতে আমাদের মা-বোনদের এমনি ইজ্জতের বলির সাথে সাথে জানটারও বলি হয়েছে শত-সহস্র জনের। দু'লাখ মা-বোনের ইজ্জত এভাবেই নিলাম হয়েছে যাতে প্রধানতম দায়ী আমাদের দেশের পাকিস্তানি প্রভুভক্ত সেই সারমেয়কুল রাজাকার বাহিনী। তরতাজা সেই যুবতী মেয়ের লাশটির অবস্থা দেখে তখন আমার মনে হলো কে যেন লোহার সাড়াশী দিয়ে আমার কলিজাটা চেপে ধরেছে। শ্বাস টানতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিলো....।।

এরই মাঝে কীভাবে যেন আমার গ্রামে আসার খবরটি পাক সেনারা পেয়ে গেছে। রাজাকার, আল বদর, আল শামস দ্বারা খবরটি তাদের কাছে পৌঁছে থাকবে হয়তো। আমার এ ধারণা অমূলক নয়। কেন না তখনকার দিনে একমাত্র ঐ সব পাকি- প্রভুভক্ত কুকুরগুলো ছাড়া এ কাজ অন্য কেউই করতো না। অবশ্য তখন ঐ শ্রেণীর অভাবও ছিলো না। অবশেষে দেখা গেলো দু'জন রাজাকার এবং দু'তিন জন পাকসেনা হন্যে হয়ে আমাদের গ্রামে ঢুকে পড়েছে।

তখনকার গাঁও গেরামের একটা প্রচলিত নিয়ম-রীতি ছিলো... যদি কেহ জানতো রাজাকার কিংবা পাক সেনা কোন গ্রামের দিকে আসছে। তাহলে একজন আরেক জনকে চীৎকারে জানান দিতো এভাবে......আইয়ে রে ...ভাই ...আইয়ে..... এ ভাষাটি আমাদের চাঁদপুরের সর্বত্র শোনেছি। আমাদের এলাকার লোকেরা ঠিক একই ভাষা ব্যবহার করে আসছে সেই সুদীর্ঘকাল ধরে যা উচ্চারিত হতো শুধু বর্ষা মৌসুমে। আষাঢ়-শ্রাবণের বৃষ্টি বলা নেই কওয়া নেই যখন তখনই ঝর ঝর বৃষ্টি ঝরতে শুরু করে। তাতে উঠোনে শুকাতে মেলে দেয়া ধান ও অন্যান্য ভেজার ভয়। তাই বৃষ্টির লক্ষণ কেহ টের পেলেই.....গাঁয়ের বউ-ঝিদের এবং অন্য সকলকে সাবধান করতো ঠিক এভাবেই চীৎকার করে... আইয়ে রে ভাই... আই য়ে ...।

আর একাত্তরে এ চীৎকার শোনার সাথে সাথে মানুষ বুঝতো (রাজাকার আর পাক-সেনাদের আগমন বার্তা) যে যেদিকে পারে পালায়। ঝোপে-জঙ্গালে, পাটক্ষেতে, ডোবা-নালায়। তখন কারো কোন হুশ-জ্ঞান থাকতো না। মনে হতো যেন রোজ কেয়ামত বা শেষ বিচারের দিন । কেউ কারো জন্যে নয়। নিজকে নিয়ে ব্যস্ত। নিজকে বাঁচাও প্রথম। নিজে বাঁচলে বাপের নাম। একাত্তরের সেই উন্মাতাল দিনগুলোতে ইহাই ছিলো চরম বাস্তবতা। সেদিন আমিও পালিয়েছিলাম।

সেদিন তারা এসেই পাশের হিন্দু বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তাদের আগমন টের পেয়ে সবাই পালিয়েছে। পালাতে পারে না শুধু ৬ মাসের বাচ্চাটি নিয়ে সুন্দরী দিপালী। খড়ের মোচার পেছনে লুকিয়েছিলো সে। নিজ বাচ্চাকে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে রেখেও শেষ রক্ষা পায়নি সে। আমাদের স্বদেশী ভাইদের একজন সেই খানা-খন্দ থেকে দিপালীকে আবিস্কার করে। চুল ধরে টেনে-হেচঁড়ে উন্মুক্ত উঠানে তাকে বের করে আনে। আমাদের স্বদেশী তিনজন আর দু'জন পাকসেনা মিলে তাকে মানে দিপালীকে নিরাবরণ করে।

ওরা দিপালীর কোলের বাচ্চাটি ছুড়ে ফেলে দেয় খড়ের মোচার পাশে। বাচ্চাটি গগন বিদারী চিৎকার করে চুপ হয়ে যায়। সেদিনের সেই ৬ মাসের বাচ্চাটির চিৎকারে মনে হয়েছে আলার সপ্ত আকাশ কেঁপে কেঁপে উঠেছিলো। বরাবরের মতো আমাদের এই অসহায় বাঙালিদের অবস্হা নিয়ে সেদিন স্রষ্টাও হয়তো নিরবে হেসেছিলো। তারপরের দৃশ্য বর্ণনার যোগ্য নয়। তারপর একে একে ছিঁড়ে-ছুড়ে খেলো দিপালীকে সেই নেকড়েগুলো।

গগনবিদারী চিৎকারে সেদিন বাচ্চাটি নীল হয়ে গিয়েছিলো। সে ঘটনার পরও সে বাচ্চাটি বেঁচে গিয়েছিলো বটে, তবে তার হাতে-পায়ে যে আঘাত পেয়েছিলো যা স্বাধীনতার প্রামান্য দলিল হিসেবে আজো প্রকাশমান। আজো সেদিনের সেই সাক্ষী বহন করে চলছে তার সে দু'টি অঙ্গা। যাকে বলা চলে স্বাধীনতার চিহ্ণ!

সেই অসহায় সুন্দরী দিপালী আজো বেঁচে আছে সেদিনের রাজ সাক্ষী হয়ে। স্বাধীনতার জন্যে নিজকে উৎসর্গীকৃত এক বঞ্চিত বীরাঙ্গানা। তার এক বড়দি' পুতুলও সে সময়কার বীরাঙ্গানা। কিন্তু সময়ের সুচিন্তি

ত ব্যবহারে সে আপাকে উন্নতির হিমালয়ের চূড়ে নিয়ে যায়। গায়ে-গতরে বেশ নাদুস-নুদুস। সে আপাও দিপালীদের কোন খোঁজ খবর রাখে না। শুধু দিপালীরা কংকালসার শরীরটি নিয়ে আজো বেঁচে আছে স্বাধীনতার পবিত্র দলিল হয়ে।

সেদিন যদি আমি এলাকায় না যেতাম, তাহলে হয়তো সেই পাকসেনারা ওভাবে আসতো না এবং দিপালীও ধর্ষিত হতো না। সেদিন থেকে সেই অপরাধবোধ আমাকে আজও নীল যন্ত্রনায় আক্রান্ত করে। সেই দিপালীরা আজো ধর্ষিত হচ্ছে এবং বেঁচে আছে বুকের ক'খান হাড় নিয়ে।

দিপালীকে নিয়ে আমি একটি বিশাল কবিতা লিখেছিলাম। যার শিরোনাম ছিলো ***'একাত্তরের গল্প'।***
যা বিভিন্ন পত্রিকায় এবং বাংলা ওয়েব ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হবার পরে 'একাত্তরের গল্প' নামক আমার অন্য একটি কাব্যগ্রন্থে কবিতাটি সংকলিত করেছি। যে গ্রন্থখানি বর্তমানে মরুপলাশ ডটকম ইন্টারনেট সংস্করণে রয়েছে।

লেখকের কৃতজ্ঞতাঃ *একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমুলক আমার একটি লেখা '**আমার দেখা একাত্তর**' সংক্ষিপ্তাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের বাংলা ওয়েবসাইট '**ভিন্নমত**' এ। এর পরপরই লেখাটি কানাডার বাংলা ওয়েবসাইট "**সদালাপ**", জনপ্রিয় **ই-মেলা**, এবং জাতীয় দৈনিক **আজকের কাগজ** এ প্রকাশিত হলে পাঠকদের কাছ হতে শত শত ই-মেইল এর মাধ্যমে আশাতীত সাড়া পাওয়া যায়। রিয়াদের বাঙালি কমিউনিটিতে উক্ত লেখাটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।*

একটি মজার অভিজ্ঞতাও তখন পাই, প্রকাশিত উক্ত 'আমার দেখা একাত্তর' লেখাটি রিয়াদের খবরগ্রুপের প্রতিনিধি নিজের নামে তাদের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন চিত্রবাংলায় পুণরায় প্রকাশ করে দেয়। যদিও তেমন ভুলের জন্য সে পরে কোন সংশোধনী চিত্রবাংলায় দেয়নি। লেখাটির জন্যে অনেক বন্ধুরা অবন্ধুতে পরিণত হয়! যাদের অবন্ধু সুলভ আচরণ আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে! মারমুখী হয়ে উঠেছিলো মৌলবাদী চক্র। আর তাতে আমি দারুণ অনুপ্রাণিত ও সাহসী হয়ে উঠি। সংক্ষিপ্ত লেখাটিকে আরো সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল করার জন্যে মনোযোগী হই। তাতে কিছু পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থের সাহায্য নিই। এ জন্য ওই সকল পত্র-পত্রিকার সম্মানিত সম্পাদক, কলামিষ্ট এবং গ্রন্থকারদের নিকট আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

পত্র-পত্রিকা / গ্রন্থ ঃ *দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক আজকের কাগজ, সাপ্তাহিক২০০০ এবং **লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে** (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামান্য দলিল গ্রন্থ) **আমি বিজয় দেখেছি**।*
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ *মেজর জেনারেল (অবঃ) সুবিদ আলী ভুইঁয়া, শাহরিয়ার কবির, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বেবী মওদুদ, হরিপদ দত্ত, কে. জি. মুস্তফা, কবি শামসুর রাহমান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, মেজর রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম এবং এম. আর. আখতার মুকুল (সদ্য প্রয়াত)*

লেখকঃ
প্রায় দু'যুগ ধরে রিয়াদ প্রবাসী এ লেখক একজন ছড়াকার, সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক এবং একজন প্রকাশক। লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ঃ ১৪টি
সম্পাদিত যৌথকাব্যগ্রন্থঃ ১ (দেয়াল বিহীন কারাগার এর প্রেম)
২. সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্মৃতিচারণ গ্রন্থ 'একাত্তর বাঙালি জাতির জন্য।
স্বত্ত্বাধিকারী ঃ মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স।

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
মরুপলাশ, রূপসী চাঁদপুর, মোহনা, চারুবন।
রিয়াদ, সউদী আরব।

Marupalash Group Magazines :

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স এর সাহিত্য ম্যাগাজিন সমূহ..

www.marupalash.com

http://www.geocities.com/rupashee_chandpur
http://www.geocities.com/mohona_riyadh
http://www.geocities.com/marupalash_riyadh
http://www.geocities.com/marupalash
http://www.geocities.com/charubon_riyadh

Email: marupalash@gmail.com

গ্রন্থখানির এখানেই সমাপ্ত